ইসলামের পারিবারিক জীবন

আবদুস শহীদ নাসিম

ইসলামের পারিবারিক জীবন

আবদুস শহীদ নাসিম

বিবিসি
বর্ণালি বুক সেন্টার

ইসলামের পারিবারিক জীবন
আবদুস শহীদ নাসিম

বিবিসি প্র. : ০০৪
ISBN : 984-645-001-6

© Author

প্রকাশক
সেহেলী শহীদ
বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি

পরিবেশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : Shotabdipro@yahoo.com

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৬
১৫তম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১

কম্পোজ
দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

ISLAMER PARIBARIK JIBON (FAMILY LIFE IN ISLAM) by Abdus Shaheed Naseem, Published by Seheli Shaheed, Bornali Book Center. Distributor : Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8311292, Mob: 01753422296, E-mail: Shotabdipro@yahoo.com, Ist Edition : December 1986, 15th Print : April 2011.

Price Tk. : 100.00 Only

بسم الله الرحمن الرحيم

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

ইসলামের পারিবারিক জীবন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ হওয়ায় বিনীত মনে দয়াময় রহমানের শুকরিয়া আদায় করছি। এ সংস্করণে দশ নম্বর অধ্যায়টি সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমান এগার নম্বর অধ্যায়টি পূর্ব সংস্করণে ছিলো দশম অধ্যায়। এ অধ্যায়েও কিছু কথা সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া পুরো বইটিতে পর্যালোচনার দৃষ্টিভংগি নিয়ে একবার নযর বুলিয়ে দিয়েছি। আশা করি বইটি এখন অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত ও ফলদায়ক হয়েছে।

আবদুস শহীদ নাসিম

১৪.৩.১৯৯৫

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের অশেষ মেহেরবাণীতে 'ইসলামের পারিবারিক জীবন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। কুরআন হাদিসের আলোকে এ গ্রন্থে খাঁটি ইসলামি পরিবারের চিত্র অংকন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডলকে ইসলামের আলোকে যারা সাজাতে চান, গড়ে তুলতে চান একটি মনোমুগ্ধকর ইসলামি পরিবেশ, তাদের পাথেয় সরবরাহ করার মহত উদ্দেশ্য নিয়েই এ গ্রন্থটি রচনা করেছি।

আমার রব যদি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাগণ যদি তাঁর পছন্দনীয় পন্থায় পরিবার গঠনের কাজে গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হন, তবেই সার্থক হবে আমার শ্রম আর পূর্ণ হবে নিয়্যত।

আবদুস শহীদ নাসিম

১.১২.১৯৮৬

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০১. পরিবার	**০৯**
ক. পরিবারের কুরআনী ধারণা	০৯
খ. পরিবারের পরিচয়	১০
গ. প্রথম মানব পরিবার	১১
ঘ. পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৩
ঙ. পরিবার প্রথা বিলুপ্তির কুফল	১৫
চ. পরিবারের প্রকারভেদ ও সদস্য	১৬
০২. বিয়ে	১৭
ক. ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব	১৭
খ. বিয়ের উদ্দেশ্য	১৮
গ. যাদেরকে বিয়ে করা হারাম	২১
ঘ. পাত্র এবং পাত্রী কেমন হওয়া চাই	২৪
ঙ. কনে দেখা	২৭
চ. কনের মতামত	২৯
ছ. বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচার করা	৩০
জ. অলীমার অনুষ্ঠান	৩২
০৩. মোহর ও যৌতুক	**৩৪**
ক. মোহর কি?	৩৪
খ. মোহরের গুরুত্ব ও মর্যাদা	৩৪
গ. দেন মোহর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?	৩৭
ঘ. মোহরের পরিমাণ	৩৮
ঙ. মোহরানা ও বর্তমান মুসলিম সমাজ	৩৯
চ. যৌতুক	৪১
০৪. ইসলামের দাম্পত্য জীবন	**৪৪**
ক. স্বামী স্ত্রীর চিরস্থায়ী সম্পর্ক	৪৪
খ. দাম্পত্য জীবনে প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসা	৪৫
গ. স্বামীর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব	৪৭
ঘ. স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার	৪৮
১. গোপন বিষয়সমূহের হিফাযত	৪৯
২. আনুগত্য ও খিদমত লাভের অধিকার	৫০
ঙ. স্বামীর ক্ষমতা	৫১
১. শাসন ক্ষমতা	৫১
২. তালাক দেয়ার ক্ষমতা	৫২

চ. স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫৪
১. মোহর ৫৪
২. ভরণ পোষণ ৫৫
৩. সদ্ব্যবহার ৫৬
৪. স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ৫৬
ছ. স্ত্রীর অধিকার ৫৮
জ. স্ত্রীর ক্ষমতা ৫৮
ঝ. স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫৮
ঞ. সফল সুখময় দাম্পত্য জীবন ৬১
১. পরস্পরকে সঠিক উপলব্ধি করা ৬৩
২. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা ৬৪
৩. পারস্পরিক সমঝোতাত ও সহিষ্ণুতা ৬৫
৪. গোপনীয়তা রক্ষা করা ৬৬
৫. যৌন দাবী পূরণ ৬৭
৬. হাস্যরসিকতা ৬৮
৭. উপহার বিনিময় ৬৯
৮. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ৭০
৯. পারস্পরিক পরামর্শ ৭১
০৫. স্বামী স্ত্রীর দীনি যিন্দেগী ৭২
ক. শিক্ষাগত সহযোগিতা ৭২
খ. ইসলামী জীবন যাপন ও ইবাদত সহযোগিতা ৭৪
গ. ইসলামী আন্দোলনে সহযোগিতা ৭৬
ঘ. স্বামীর বিরোধিতায় স্ত্রী দীনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারেনা ৭৮
ঙ. বদনসীব স্ত্রী ৭৯
০৬. সন্তান ও পিতামাতার হক ৮১
ক. পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক ৮১
খ. সন্তানদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ৮২
১. সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ ৮২
২. কানে আযান দেয়া ৮৩
৩. আকীকা করা ও নাম রাখা ৮৩
৪. তাহনীক ও খতনা করা ৮৪
৫. স্নেহ মমত ৮৪
৬. দুধ পান করানো ৮৪
৭. লালন পালন ও ভরণ পোষণ ৮৫
৮. শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠন ৮৫
৯. সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার ৮৬
গ. পিতামাতার অধিকার ৮৭

০৭. পর্দা ৯১
ক. পর্দার পরিচয় ৯১
খ. পর্দার উপকারিতা ৯১
গ. পর্দার বিধান ৯২
ঘ. পর্দার প্রাথমিক নির্দেশ ৯২
ঙ. দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশাবলী ৯৩
চ. তৃতীয় পর্যায়ের নির্দেশ ৯৩
ছ. শেষ পর্যায়ের নির্দেশাবলী ৯৩
জ. আরো কতিপয় নির্দেশ ৯৪
ঝ. পর্দার নির্দেশাবলীর বিশ্লেষণ ৯৪
ঞ. যাদের সম্মুখে নারীরা সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে ৯৭
ট. গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের কথা ৯৮
ঠ. ইসলামের নিকাব বিধান ৯৯
০৮. ইসলামী পরিবারের কতিপয় গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ১০৮
ক. আত্মীয় স্বজনের অধিকার ১০৮
খ. উত্তরাধিকার ১১০
গ. চাকর চাকরাণীর অধিকার ১১২
ঘ. প্রতিবেশীর অধিকার ১১৩
১. প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্কের আসমানী তাকীদ ১১৩
২. ঈমানের সম্পর্ক ১১৪
৩. নিজের ভালোমন্দ জানার মাপকাঠি ১১৪
৪. হাদীয়া পাঠানো উচিত ১১৪
৫. নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার ১১৪
ঙ. মেহমানের অধিকার ১১৫
০৯. ইসলামী পরিবারের দীনি যিন্দেগী ১১৬
ক. আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১১৬
খ. দীনি ইলম চর্চা ১১৭
গ. সালাত (নামায) কায়েম ১১৮
ঘ. অন্যান্য ইবাদত ১১৯
ঙ. পরিবারে ইসলামী আদব আচারের পরিবেশ সৃষ্টি ১২০
১. বর্জনীয় অসৎ গুণাবলী ১২১
২. বরণীয় গুণাবলী ১২১
৩. কতিপয় করণীয় কাজ ১২২
চ. দীনি পরিবেশ সৃষ্টির উপায় ১২২
১. আমাদের সমাজ পরিবেশ ১২২
২. খোদার পথে চলার বজ্রকঠিন শপথ নিতে হবে ১২৩

৩. অবিরাম দা'ওয়াত ও সংশোধনের কাজ ১২৪
৪. চারিত্রিক আদর্শ স্থাপন ১২৫
৫. পারিবারিক বৈঠক ১২৬
৬. দৈনন্দিন কাজের রুটিন ১২৭
৭. পরস্পরের জন্যে দোয়া করা ১২৯
ছ. ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ ১৩১
জ. সন্তান ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসার সীমা ১৩৩
১০. ইসলামী পরিবারে সুন্দর জীবনের উত্তম আদর্শ ১৩৭
এক : ঈমানের সৌন্দর্য ১৩৮
দুই : রসূলকে অনুসরণের আদর্শ ১৩৯
তিন : দৈহিক পবিত্রতার সৌন্দর্য ১৪০
চার : মনের সৌন্দর্য ১৪০
পাঁচ : ইবাদতের সৌন্দর্য ১৪১
ছয় : সালাত আদায়ের সৌন্দর্য ১৪২
সাত : কুরআন পাঠের সৌন্দর্য ১৪৩
আট : ছাত্রজীবনের সৌন্দর্য ১৪৪
নয় : সন্তানের আদর্শ ১৪৫
দশ : পানাহারের সৌন্দর্য ১৪৬
এগার : কথাবার্তার সৌন্দর্য ১৪৬
বার : সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য ১৪৮
১১. আখিরাতে ইসলামী পরিবার ১৪৯
ক. আখেরতের চিত্র ১৪৯
১. আখেরাত কি? ১৪৯
২. আখেরাতের সূচনা ১৫০
৩. মৃত্যু ১৫০
৪. আলমে বরযখ ১৫২
৫. কিয়ামত হাশর আদালত ১৫৩
৬. জান্নাত ও জাহান্নাম ১৫৬
৭. জান্নাত ও জাহান্নামে কারা যাবে? ১৫৮
৮. আদর্শ সমাজ গঠনে পরকালীন চিন্তার গুরুত্ব ১৫৯
খ. ইসলামী পরিবারের পরকালীন জীবন ১৬০
১. তাদের মৃত্যু ও বরযখ জীবন ১৬১
২. ইসলামী পরিবারের হাশর ১৬৩
৩. ইসলামী পরিবারের জান্নাতী জীবন ১৬৫
গ্রন্থপঞ্জি ১৬৮

ক. পরিবারের কুরআনী ধারণা

মহান মালিক আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের, প্রতিটি প্রাণীর সৃষ্টি কাঠামো ঠিক করে দিয়ে তার মধ্যে তার বিশেষ গতি প্রকৃতি দান করেছেন, বিশেষ প্রবৃত্তি ও প্রবণতা দান করেছেন। তার জীবন যাপন পদ্ধতি তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। অন্য সকল জীব ও জড়বস্তুর মতো মানুষকেও এ নীতির ভিত্তিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى - (طه : ٥٠)

"তিনি হলেন আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসের মূল সৃষ্টিকাঠামো দান করেছেন। অতপর তাকে পথনির্দেশ দান করেছেন।" (সূরা তোয়াহা ঃ ৫০)

প্রতিটি সৃষ্টির জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তার জুড়ি বানিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - (الذاريت : ٤٩)

"আর প্রতিটি জিনিসেরই আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি। সম্ভবত এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৪৯)

জোড়া সৃষ্টি করে উভয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানুষের অবস্থাও তাই। প্রথমে তিনি একজন মানুষ তৈরী করলেন। অতপর তার থেকে সৃষ্টি করলেন তার জোড়া এবং তাদের একের প্রতি অপরের পরম আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিলেন। এ আকর্ষণ ও পরস্পরে মিলিত হবার আকাঙ্খা এবং একত্রে বসবাসের প্রবণতা তার মধ্যে চিরন্তন করে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا - (الاعراف : ١٨٩)

"তিনিই তোমাদের রব, যিনি একটি আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জুড়ি, যেনো তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে। অতপর পুরুষটি যখন স্ত্রীকে জাপটে ধরলো, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করলো।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৯)

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ۔ (الروم: ٢١)

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জুড়ি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেনো তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (সূরা আর রূম ঃ ২১)

এভাবে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে সন্তান প্রজননের তীব্র আকাঙ্খা পয়দা করে দিয়েছেন। কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۔ (النساء: ١)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সে মহান প্রভুকে ভয় করো যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি আর এ দু'জন থেকেই (সারা বিশ্বে) ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ।" (সূরা নিসা ঃ ১)

এমনি করে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে মানুষের বংশধারা। আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে মানুষ একে অপরের সাথে। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۔ (الفرقان: ٥٤)

"তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি পানি থেকে একজন মানুষের অস্তিত্ব দান করেছেন। পরে তার থেকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কগত দু'টি আত্মীয়তার ধারা শুরু করেছেন। আর তোমার রব বড়ই শক্তিমান।" (সূরা আল ফুরকানঃ ৫৪)

খ. পরিবারের পরিচয়

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পরিবারের। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অতপর একজনের সান্নিধ্য আরেক জনের জন্যে পরমশান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাজনক করে দিয়েছেন। তিনি তাদের উভয়ের

মিলনের বৈধ পন্থাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তাদের এ বৈধ মিলনকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়েছে পরিবারের। তাদের এ বৈধ মিলন থেকেই জন্ম লাভ করেছে তাদের বংশধারা, সৃষ্টি হয়েছে আত্মীয়তা।

সুতরাং মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন পুরুষ, একজন নারী ও তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে গড়ে ওঠে যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি তা-ই হলো– 'পরিবার'।

বলা বাহুল্য, নারী ও পুরুষের মাঝে, বৈধ পন্থার সম্পর্ক হলো বিয়ে। সুতরাং পরিবার সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বিয়ে। অতপর একটি পরিবার বেশ প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে থাকে। তারপর একটি পরিবার থেকে জন্ম নেয় অনেকগুলো পরিবার। এভাবে অব্যাহত গতিতে বিস্তার লাভ করে পরিবারের ধারা। আর এ ধারাবাহিকতার পরিণামে জন্ম লাভ করে মানুষের বংশ ও জাতি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ (الحجرات: ١٣)

"হে মানুষ! তোমাদের আমিই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতপর তোমাদের সাজিয়েছি জাতি ও গোত্ররূপে, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

গ. প্রথম মানব পরিবার

উপরে উল্লেখ করা কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে আমরা একথা অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে একজন মানুষ তৈরী করেন। অতপর তার থেকেই তৈরী করেন তার স্ত্রীকে। পরে তাঁদের দু'জন থেকে জন্ম নেয় তাদের সন্তানেরা। বস্তুত আল্লাহর সৃষ্ট এই প্রথম পুরুষটি, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানদের নিয়েই গঠিত হয় দুনিয়ার প্রথম পরিবার। আল্লাহর তৈরী এ প্রথম মানুষটি হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বিবি হাওয়া। পরিবারের সদস্য প্রথমত এঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনই মাত্র ছিলেন। সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর এ প্রথম পরিবারটিকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ (البقرة: ٣٥)

"আমরা বললাম ঃ হে আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী দু'জনেই জান্নাতে বসবাস করো। যা ইচ্ছা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে খাও। কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়োনা। গেলে যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ৩৫)

কিন্তু, শয়তান কল্যাণকামীর বেশে এসে তাঁদের ধোকায় ফেলে এবং প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ঐ গাছের স্বাদ আস্বাদন করতে বাধ্য করে। অবশ্য পরক্ষণেই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং বিনয়ে অবনত হয়ে মহান মালিকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ (الاعراف: ٢٣)

"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করে বসেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবো" (সূরা আ'রাফ ঃ ২৩)

অতপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাফ করে দেন এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাঁদের পৃথিবীতে বসবাস করতে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ـ (الاعراف: ٢٥)

"পৃথিবীতেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদের মরতে হবে আর সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২৫)

এ সময় তিনি তাঁদের আরো বলে দিলেন, পৃথিবীর জীবনে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা যদি আল্লাহ প্রদত্ত জীবনধারা মেনে চলে, তবে পুনরায় যখন তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তখন জান্নাত লাভের ব্যাপারে তাঁদের আর কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ থাকবেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ (البقرة: ٣٨)

"অতপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছুবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের কোনো ভয় ভীতি ও দুশ্চিন্তা থাকবেনা।" (সূরা বাকারা ঃ ৩৮)

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত হিদায়াত ও জীবন বিধান নিয়ে পৃথিবীতে এলেন মানুষের প্রথম পরিবার। মাটির পৃথিবীতে তারা কার্যকর করতে থাকলেন

প্রাকৃতিক ও খোদা প্রদত্ত বিধান। আর তাদের থেকে জন্ম নিতে থাকলো নারী পুরুষের মানব বংশ ঃ

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً - النساء: ١

"আর (তাদের রব) তাদের দু'জন থেকেই (সারা পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী।" (সূরা নিসা ঃ ১)

ঘ. পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহুসংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। আর সমাজেরই বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হলো রাষ্ট্র। পরিবার প্রথার অবর্তমানে সমাজ টিকে থাকতে পারেনা। সুতরাং সমাজ ও তমদ্দুনিক সুস্থতার জন্যে পরিবার অপরিহার্য।

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে মানব সমাজ। আর নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল ও তীব্র আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিলনই হলো তাদের প্রাকৃতিক দাবী। এ মিলন যদি হয় লাগামহীন পন্থায়, তবে সমাজ ও তমদ্দুনে ফিতনা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই অবধারিত। বস্তুত, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি পন্থা অনুযায়ী নারী পুরুষের সঠিক সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সমাজ ও সভ্যতার সুস্থতা ও নিরাপত্তা। আর তাদের উভয়ের মধ্যে খোদায়ী বিধি অনুযায়ী এ সম্পর্ক কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় তাদের পারিবারিক জীবনের। পারিবারিক জীবন ছাড়া মানুষের দাম্পত্য জীবন কোনো অবস্থাতেই সুখের হতে পারেনা। স্বাচ্ছন্দ্যের হতে পারেনা।

অতপর তাদের থেকে জন্ম নেয় তাদের সন্তান সন্ততি। সন্তানের লালন পালনের জন্যে পরিবারিক জীবন অপরিহার্য। সন্তানের সুশিক্ষার জন্যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পরিবারেই সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়।

তাছাড়া মানুষ সামাজিক জীব। তারা একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকতে চায়। বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন মানুষের প্রকৃতি বিরোধী। আর এজন্যেও মানুষের পারিবারিক জীবন অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি মানুষের প্রকৃতিজাত করে দিয়েছেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ দয়া এবং

পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম প্রীতি মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিজাত নিয়ম। এসব শুভ মানবিক গুণাবলীই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা দান করেছে। এসব গুণাবলী সংরক্ষণের জন্যে যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা।

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো। এ আয়াতগুলো পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَّ حَفَدَةً - (النحل: ٧٢)

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের জুড়িদের থেকে তোমাদের দান করেছেন অনেক পুত্র ও পৌত্র"। (আন-নহল ঃ ৭২)

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّ رَحْمَةً - (الروم : ٢١)

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন।" (আর-রূম ঃ ২১)

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا - (الاحقاف : ١٥)

"তার মা তাকে অনেক কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে দারুণ কষ্টে আর গর্ভধারণ থেকে স্তন্যত্যাগ পর্যন্ত ত্রিশ মাস অতিবাহিত করেছে।" [সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ - (آل عمران : ١٤)

"মানুষের জন্যে তাদের মনোপূত জিনিস, নারী, সন্তান, সোনা রূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষিজমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৪)

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا۔

(الفرقان : ٥٤)

"তিনিই আল্লাহ, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (সূরা ফুরকান ঃ ৫৪)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔ (الفرقان : ٧٤)

"প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও। আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানাও।" (আল ফুরকান ঃ ৭৪)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا۔ (التحريم : ٦)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।" (আত-তাহরীম ঃ ৬)

পরিবার রীতি এবং পারিবারিক বন্ধন ছাড়া পবিত্র কুরআনের এসব নির্দেশ ও দৃষ্টিভংগি কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারেনা। তাছাড়া পারিবারিক পরিবেশ ছাড়া এরূপ শান্তিময় জীবন লাভ করা সম্ভবই হতে পারেনা।

৬. পরিবার প্রথা বিলুপ্তির কুফল

তথাকথিত প্রগতিবাদ মানুষের পারিবারিক জীবনকে শেষ করে দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগত থেকে পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর এতে করে তাদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি। আসলে, মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্যে পরিবার নামক দুর্গের চাইতে বড় আশ্রয় আর কিছুই নেই। পরিবার ধ্বংসের দ্বারা মানুষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবনে যে চরম অশান্তি নেমে আসে এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল ঃ

১. যৌন জীবনে উশৃঙ্খলা ও অশান্তি নেমে আসে;

২. প্রেম প্রীতি, স্নেহ ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বিদূরিত হয়,

৩. দয়া ও সহানুভূতি দূর হয়ে যায়;
৪. সুসন্তান লাভ করা যায়না;
৫. সন্তানের সঠিক লালন পালন ও সুশিক্ষা হয়না;
৬. সমাজে কোনো আদর্শিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেনা;
৭. সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত ধসে পড়ে;
৮. বংশধারা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে যায়;
৯. নারীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়;
১০. নারীকে কঠোর শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়;
১১. পিতা মাতার অধিকার বিনষ্ট হয়;
১২. সন্তান সন্ততির অধিকার বিনষ্ট হয়;
১৩. দাম্পত্য জীবনের সুখ মাধুর্য বিলুপ্ত হয়;
১৪. সন্তানের প্রতিভা বিকাশে বিঘ্ন ঘটে।

চ. পরিবারের প্রকারভেদ ও সদস্য

পরিবার সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন ঃ (ক) যৌথ পরিবার ও (খ) একক পরিবার।

পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে গঠিত হয় যৌথ পরিবার। আর স্বামী স্ত্রী দু'জনকে নিয়ে গঠিত হয় একক পরিবার। অতপর তাদের সন্তান সন্ততি জন্মলাভ করে এবং সন্তানদের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তারা একক পরিবারের সদস্য থাকে।

পিতামাতা বৃদ্ধ হলে ইসলাম তাদের দায়িত্ব সন্তানের উপর অর্পণ করে। আর পিতামাতার অবর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাইবোনদের দায়দায়িত্ব বড় ভাই কিংবা ভাইদের উপর ন্যস্ত করে।

সংসারের চাকর চাকরাণীদেরও ইসলাম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অবশ্য তারা উত্তরাধিকার লাভ করবেনা।

দুইঃ বিয়ে

ক. ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব

মানব জীবনের শান্তি ও সুশৃঙ্খলার জন্যে আমরা পরিবারের অপরিহার্য গুরুত্বের কথা আলোচনা করেছি। পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম সিঁড়ি। কিন্তু পরিবার কিভাবে গঠিত হবে? একথা বলাই বাহুল্য যে বিয়ের মাধ্যমেই পরিবারের গোড়াপত্তন হয়। বিয়ে দ্বারাই রচিত হয় পরিবার। আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষের মধ্যে যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁদের একের সাথে অপরের মিলনের যে উদগ্র কামনা দিয়ে দিয়েছেন, তারা কিভাবে তা চরিতার্থ করবে? তাদের একজনকে আরেক জনের উপর যে নির্ভরশীল প্রবৃত্তি দান করা হয়েছে, তারা কিভাবে তা কার্যকর করবে? তাদের পরস্পরের প্রতি যে প্রেম, ভালোবাসা ও হৃদ্যতা দান করা হয়েছে, সেটা বাস্তবায়নের সঠিক ও স্থায়ী পন্থাই বা কি? আর মানব বংশের সুস্থ ও সুষ্ঠু বিস্তার ও বিকাশ লাভই বা কোন্ পন্থায় হতে পারে? এসব প্রশ্নের জবাব একটাই। আর তা হলো 'বিয়ে'। বিয়েই হলো এসব বিষয়ের খোদা প্রদত্ত বিধান।

বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। বিয়ে হলো সমাজ পরিসরে খোদা প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে এমন এক বন্ধন (عقد) ও সম্পর্ক স্থাপন, যার কারণে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যায়। একজন আরেকজনের উপর সুনির্দিষ্ট অধিকার লাভ করে এবং একজনের জন্যে অপরজনের উপর বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়।

বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে নারীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ (الروم : ٢١)

"আর আল্লাহর নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেনো তাদের কাছ থেকে তোমরা পরম শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারো।" (সূরা রূম ঃ ২১)

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যতো নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সকলেই বিয়ে করেছেন। বিয়ে ছিল নবীগণের স্থায়ী সুন্নাত। কুরআন বলে ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً.

(الرعد : ٣٨)

"(হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী রসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদের জন্যে স্ত্রী এবং সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।" (আর রাআদ ঃ ৩৮)

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ -

(رواه ابن ماجه)

"বিয়ে করা আমার রীতি ও স্থায়ী কর্মপন্থা। অতএব, যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত ও রীতি অনুযায়ী আমল করবেনা, সে আমার উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

"যার স্ত্রী নেই সে দরিদ্র, দরিদ্র, দরিদ্র (তিনবার)। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ ওগো আল্লাহর রসূল! যদি সে বিরাট সম্পদশালী হয়ে থাকে? তিনি বললেন ঃ সে বিরাট সম্পদশালী হলেও সে দরিদ্র। অতপর তিনি বললেন ঃ যে নারীর স্বামী নেই, সে মিসকীন, মিসকীন, মিসকীন (তিনবার)। লোকেরা আরয করলো ঃ ওগো আল্লাহর রসূল! যদি সে সম্পদশালিনী হয়ে থাকে? তিনি বললেন ঃ সে সম্পদশালিনী হয়ে থাকলেও স্বামী ছাড়া সে মিসকীন।"[১]

বস্তুত মানব জীবনে বিয়ে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যা ছাড়া মানুষ তার মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনা।

খ. বিয়ের উদ্দেশ্য

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। যেসব জিনিস তার এ আশরাফিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে, তন্মধ্যে বিয়ে অন্যতম। নারী পুরুষের মধ্যে বন্ধনের 'বিয়ে' নামক যে ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, তা মানুষের জন্যে এক বিরাট নিয়ামত। বিয়ে দ্বারা মানুষের অসংখ্য কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। তবে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য চারটি ঃ

---

১. সূত্র ঃ গুনিয়াতুত তালেবীন ঃ আবদুল কাদের জীলানী।

১. নারী ও পুরুষের যৌন কামনা চরিতার্থ করার পন্থাকে বিধিবদ্ধ করা এবং যৌন উশৃঙ্খলা থেকে তাদের পবিত্র রাখা।

২. নারী ও পুরুষের প্রাকৃতিক প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার দাবীকে পূত পন্থায় পূর্ণ করা এবং তার ফিতরাতের এসব দাবীকে বিকশিত করা ও পূর্ণতা দান করা।

৩. বংশ বিস্তার ও

৪. পরিবার গঠন।

☐ এ সংক্রান্ত কুরআনের দলীল প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। প্রথম উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ - (النساء : ٢٤)

"এ ছাড়া যতো নারী আছে, নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে তাদের হাসিল করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে, যদি বিয়ের দুর্গে তাদের সুরক্ষিত করো এবং মুক্ত যৌন কামনা চরিতার্থে উদ্যত না হও।" (সূরা নিসা ঃ ২৪)

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ -(النساء :٢٥)

"তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো এবং প্রচলিত পন্থায় তাদের মোহর আদায় করো, যেনো তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকে, স্বাধীনভাবে যৌন বাসনা পূরণে লিপ্ত না হয় এবং চুরি করে প্রেম করে না বেড়ায়।" (সূরা নিসা ঃ ২৫)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -(البقرة : ١٨٧)

"স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের আচ্ছাদান।"

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً - (النحل : ٧٢)

"আর আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের দান করেছেন পুত্র ও পৌত্র।"

☐ দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ۔ (الروم : ٢١)

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হলো এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেনো তাদের নিকট থেকে তোমরা পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম ভালোবাসা, দয়ামায়া ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (সূরা রূম ঃ ২১)

☐ *আর তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ*

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۔ (الشورٰى : ١١)

"তিনি তোমাদের জাতি থেকে তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন আর জানোয়াদের মধ্য থেকেও তাদের জুড়ি বানিয়েছেন আর এভাবেই তিনি তোমাদের বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।" (আশ্ শূরা ঃ ১১)

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۔

"আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর তাদের দু'জন থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী।" (সূরা নিসা ঃ ১)

☐ *চতুর্থ উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নের আয়াতগুলো থেকে ঃ*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا ۔

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা তাহারীম ঃ ৬)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۔ (الفرقان : ٧٤)

"পরওয়ারদেগার! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।" (সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪)

রসূলগণও সকলেই পরিবার গঠন করেছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

"(হে মুহাম্মদ) তোমার পূর্বেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি। আর তাদের জন্যেও স্ত্রী এবং সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।" (সূরা আর-রা'আদ ঃ ৩৮)

গ. যাদেরকে বিয়ে করা হারাম

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুদ্ধি জ্ঞান দান করে তাকে সুসভ্য করে সৃষ্টি করেছেন। বিবেক ও নৈতিকতা দান করে তাকে "আশরাফুল মাখলুকাত" করেছেন। তার এসব মহৎ গুণ বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণের জন্য ইসলাম তার যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। ইসলাম কতিপয় নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। পুরুষের জন্যে যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, নিম্নে তাদের তালিকা প্রদত্ত হলো কুরআনের আলোকে ঃ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۗىِٕكُمْ وَرَبَاۗىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۡ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۠ وَحَلَاۗىِٕلُ اَبْنَاۗىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۗءِ ۔ (النساء: ٢٢ - ٢٤)

"তোমাদের পিতা যেসব মেয়েলোক বিয়ে করেছে, তোমরা কখনো তাদের বিয়ে করোনা। অবশ্য পূর্বে (জাহেলী যুগে) এমন কিছু হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। এটা জঘন্য নির্লজ্জ কাজ, পাপ পংকিলতা এবং নোংরা পন্থা। তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইয়ের কন্যা ও বোনের কন্যাদের। আর তোমাদের সেসব মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোনদের। স্ত্রীদের মা এবং স্ত্রীদের সেসব কন্যাদের যারা তোমাদের কোলে লালিতপালিত হয়েছে; অবশ্য

এসব স্ত্রীদের সাথে যদি তোমরা সহবাস করে থাকো। আর যদি তা করে না থাকো, তবে তাদের কন্যাদের বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীদের। এক সাথে দুই সহোদর বোনকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। পূর্বে এমন কিছু হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। আর সেসব নারীরাও তোমাদের জন্যে হারাম, যারা অপরের বিয়ের দুর্গে আবদ্ধ।" (সূরা নিসা ঃ ২২-২৪)

কুরআনের এ নির্দেশিকা থেকে জানা গেলো, নিম্নোক্ত নারীদের বিয়ে করা হারাম ঃ

১. পিতার স্ত্রী ঃ অর্থাৎ সৎ মা। তারা পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী হোক কিংবা রেখে মরা স্ত্রী তাতে কিছু যায় আসেনা।

২. নিজ মা বা গর্ভধারিণী। অনুরূপভাবে দাদী এবং নানীও হারাম।

৩. কন্যা। পুত্রের কন্যা এবং কন্যার কন্যাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ধারাবাহিকতা নিম্নদিকে যতোই বিস্তৃত হোক না কেন।

৪. বোন। পিতা এবং মাতার দিক থেকে সৎ বোনও এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. ফুফু বা পিতার বোন, চাই আপন হোক কিংবা সৎ।

৬. খালা।

৭. ভাইয়ের কন্যা

৮. বোনের কন্যা।

৯. দুধ মা, যিনি শৈশবে দুধ পান করিয়েছেন।

১০. দুধ বোন।[২]

১১. স্ত্রীর মা অর্থাৎ শ্বাশুড়ী।

১২. স্ত্রীর কন্যা। অর্থাৎ যে স্ত্রীর সাথে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক কার্যকর হয়েছে, তার আগের পক্ষের কন্যা।

১৩. ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী (পালিত পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়।)।

১৪. দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করাও হারাম। কোনো মেয়ে এবং তার ফুফু কিংবা খালাকেও একত্রে স্ত্রী বানানো হারাম। (বুখারী)

---

২. রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ - (بخارى، مسلم)

বংশ সম্পর্কের কারণে যারা যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা তারা হারাম– (বুখারী-মুসলিম)। এদের পরিচয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। –গ্রন্থকার

১৫. অপরের স্ত্রী। (যতোক্ষণ না সে বিধবা হয়)।

আরো কতিপয় নারীকেও হারাম করা হয়েছে ঃ

১৬. মুশরিক ও কাফির নারী। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ - (البقرة : ٢٢١)

"তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করোনা, যতোক্ষণনা তারা (তাওহীদি) ঈমান আনে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

কোনো মুমিন নারী কোনো মুশরিকের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেনা ঃ

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا - (البقرة : ٢٢١)

"আর তোমরা মুশরিক (পুরুষদের) বিয়ে করোনা, যতোক্ষণনা তারা ঈমান আনে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

কাফির নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - (الممتحنة : ١٠)

"(হে মুসলমানরা!) কাফির নারীদের তোমরা বিয়ের বন্ধনে বেঁধে রেখোনা।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

মূলত মুশরিক ও কাফিররা সবাই একই জাতের।

১৭. ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারীকে কোনো মুমিন বিয়ে করতে পারেনা এবং ব্যভিচারী পুরুষকেও কোনো মুমিন নারী বিয়ে করতে পারেনা।

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ - (النور : ٣)

"যিনাকারীকে যিনাকারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া কেউ বিয়ে করবেনা আর যিনাকারিণীকেও যিনাকারী বা মুশরিক ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করবেনা। ঈমানদারদের জন্যে এরা হারাম। (সূরা নূর ঃ ৩)

১৮. একত্রে চারজনের অধিক স্ত্রী অর্থাৎ পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করাও হারাম।[৩]

১৯. সাময়িক উপভোগের জন্যে ছেড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিয়ে

---

৩ . সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৩।

করাও ইসলাম হারাম করে দিয়েছে।[৪]

ঘ. পাত্র এবং পাত্রী কেমন হওয়া চাই

উপরে উল্লেখিত নারীদের বাদ দিয়ে বাকী সকল নারীদের মধ্য থেকে মুমিন পাত্র তার পাত্রী খুঁজে নেবে। এবং পাত্রী খুঁজে নেবে তার পাত্র। পাত্র পাত্রী বাছাইয়ের ব্যাপারে ইসলাম সবচাইতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে চরিত্র, নৈতিকতা ও দীনদারীর উপর। এছাড়াও আরো কিছু কিছু গুণের কথা ইসলাম উল্লেখ করেছে। কোনো পবিত্র চরিত্রবান নারীর বেলায়ও তা-ই। পবিত্র চরিত্রের লোকেরা পবিত্র চরিত্রের জুড়িই গ্রহণ করে ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ـ (النور: ٢٦)

"নোংরা চরিত্রের নারী নোংরা চরিত্রের পুরুষের জন্যে এবং চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীন নারীর জন্যে। আর পবিত্র চরিত্রের নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্যে এবং চরিত্রবান পুরুষ পূত চরিত্রের নারীর জন্যে।" (সূরা নূর ঃ ২৬)

কুরআনের অপর একটি আয়াতেও ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীদের বিয়ে করতে মুমিনদের পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৫]

আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনেক অবনতি ঘটেছে। বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পরকালের চিন্তার চাইতে পার্থিব চিন্তা তাদের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। তাই বর্তমানে মুসলমান সমাজে পাত্র বা পাত্রী সন্ধানের ব্যাপারে দীনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে দুনিয়াবী শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য পাচ্ছে। এটা মুসলমানদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের কারণ। এটা তাদের অধঃপতনের সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু সাধারণ সামাজিক পরিবেশ এরকম হওয়া সত্বেও মুসলমানদের মধ্যে অনেক দীনদার লোকও আছেন। তারা দীনদার স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের আলোকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন গঠনে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আর একজন মুসলমানের জন্যে এটাই কাম্য।

যারা কেবলমাত্র সম্পদ বা রূপ সৌন্দর্যের দিক বিচার করে কাউকে বিয়ে করেন এবং দীন বা তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য করেননা, তাদের দাম্পত্য জীবন খুব

---

৪. এ নিষেধাজ্ঞার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।

৫. সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩।

কম ক্ষেত্রেই সুখকর হয়ে থাকে। কারণ দুনিয়াবী কামনা বাসনার সীমাহীন অতৃপ্তি সব সময়ই তাদের দংশন করতে থাকে। আর এ ধরনের দম্পতিদের দ্বারা ইসলামী পরিবারও গঠিত হয়না। কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে আরেকটি উত্তম মূলনীতি দিয়েছে। তা হচ্ছে, প্রকৃত মুমিন নারী যদি দাসীও হয়ে থাকে, তবু মুশরিক অপরূপ সুন্দরীর চেয়ে সে অনেক উত্তম ঃ

وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ (البقرة: ٢٢١)

"জেনে রাখো! ঈমানদার দাসী মহিলাও মুশরিক নারীর তুলনায় অনেক ভালো; সে তোমার যতোই পছন্দসই ও মনলোভা হোক না কেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

এমনি করে মুমিন মহিলাদেরকেও রূপের অধিকারী ঈমানহীন মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ঈমানদার দাস হলেও তাকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ.

"একজন ঈমানদার দাসও মুশরিকের তুলনায় অনেক ভালো, যদিও তার রূপ সৌন্দর্য তোমাদের আকৃষ্ট করে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

কুরআন মজীদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে বংশ গোত্র বানানো হয়েছে কেবল পরিচিতির জন্যে। তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রসর হলে যে কোনো বংশ বা গোত্রের লোকই হোক না কেন সে হবে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. (الحجرات: ١٣)

"তোমাদের সবচাইতে পরহেযগার লোকেরাই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত।" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

হাঁ, তবে বংশ বা গোত্র ঈমান, শিক্ষা সভ্যতা ও তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রসর হলে নিঃসন্দেহে সে বংশ গোত্র উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং পাত্র বা পাত্রী সন্ধানকালে এসব দিক থেকে মর্যাদাবান বংশ বা গোত্রের সন্ধান অবশ্যি করা যেতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক, ঈমান ও তাকওয়াবিহীন বংশ মর্যাদা দাম্পত্য জীবনে কেবল লাঞ্ছনাই বয়ে আনে।

বস্তুত, ঈমানদার ব্যক্তিকে এমন ঈমানদার মহিলা বিয়ে করতে হবে, যে কেবল নিজেই ঈমানদার হবেনা, বরং স্বামীকেও ঈমানের পথে চলতে সাহায্য

করবে। একবার সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ সর্বোত্তম পুঁজি কি– তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তবে তা অর্জনের জন্য অবশ্যই আমরা চেষ্টা সাধনা চালাতাম। তখন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَّ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَّ زَوْجَةٌ مُّؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلٰى اِيْمَانِهٖ - (مسند احمد- ترمذى)

"সর্বোত্তম পুঁজি হলো আল্লাহর স্মরণে সিক্ত যবান, শোকরগুযার অন্তর এবং এমন মুমিন স্ত্রী, যে হবে স্বামীর দীন ও ঈমানের পক্ষে সাহায্যকারী।"

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

"চারটি কারণে কোনো মহিলাকে বিয়ে করা হয়ে থাকে ঃ

১. তাঁর ধন সম্পদ থাকার কারণে,

২. বংশ মর্যাদার কারণে,

৩. রূপ সৌন্দর্যের কারণে এবং

৪. দীনদারীর কারণে। তবে তোমরা দীনদার মেয়েদেরই বিয়ে করো। সুখ শান্তিতে থাকো।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ (المسلم)

"দুনিয়ার সবকিছুই সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে, নেক চরিত্রের স্ত্রী।" (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَّ فَسَادٌ عَرِيْضٌ - (ترمذى)

"যখন এমন কাউকেও জুড়ি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমাদের কাছে

প্রস্তাব আসে, যার দীন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ করো, তবে তাকে জুড়ি হিসেবে গ্রহণ করবে। যদি এমনটি না করো তবে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে।" (তিরমিযী)

এ সম্পর্কে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। তাতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ۔

"তোমরা কেবল রূপ সৌন্দর্য দেখেই নারীদের বিয়ে করোনা। কারণ, রূপ সৌন্দর্য তাদের বিপথগামীও করে দিতে পারে। আর তাদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করোনা। কারণ, ধন সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও অবাধ্য করে দিতে পারে। তোমরা বরঞ্চ নারীদের দীনদারী দেখে শাদী করো। মনে রেখো, যদি দীনদার হয়, তবে একটি কালো দাসীও অন্যদের তুলনায় উত্তম।" (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো যে ঃ

১. বর ও কনে অনুসন্ধানকালে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত তাদের ঈমান, দীনদারী, তাকওয়া ও নৈতিক চরিত্র।

২. ঈমান ও দীনদারীর সাথে সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদাও তালাশ করা যেতে পারে।

৩. কিন্তু ঈমান ও দীনহীন সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদা এগুলোর কিছুই বিয়ের ব্যাপারে মুমিনদের কাম্য হওয়া উচিত নয়।

৪. নেককার স্ত্রী দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ।

৫. দীনদার চরিত্রবান জুড়ি গ্রহণ না করলে দাম্পত্য জীবনে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

৬. দীনদার পাত্রী রূপ সৌন্দর্যহীন হলেও উত্তম।

৭. মুমিন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই কাফির, মুশরিক ও ব্যভিচারী চরিত্রহীন জুড়ি গ্রহণ করতে পারেনা।

ঘ. কনে দেখা

কোনো মুসলমানের নিকট কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব এলে সে মুসলমানের উচিত বিয়ের পূর্বে উক্ত মেয়েকে দেখে নেয়া। এ দেখা ইসলামে শুধু

বিধিসম্মতই নয়, বরঞ্চ এজন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ দেখার মধ্যে তিনটি ফায়দা রয়েছে ঃ

১. এতে করে বিয়ের পর পস্তাতে হয়না, হতাশায় ভুগতে হয়না।

২. এতে পাত্রীকে পছন্দ করে নেয়া যায়, পাত্র বিবাহে উৎসাহিত হতে পারে এবং আকর্ষণ লাভ করতে পারে।

৩. এতে করে বিয়ের পূর্বেই বর কনের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার আশা করা যায়।

কনে দেখার ব্যাপারে ছেলেদের একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। আর তা হচ্ছে, কেবল বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই কনে দেখতে হবে, চোখের লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম কেবল বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই কোনো মেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছে। বরং ইসলাম পছন্দসই মেয়েদের বিয়ে করতেই উৎসাহিত করেছে। কুরআন বলেছে ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

"নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মনঃপূত, তাদের তোমরা বিয়ে করো।" (সূরা নিসা ঃ ৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ - (ابو داؤد)

"তোমাদের কাছে কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে, তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু অংগ দেখে নেয়া উচিত, যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে।" (আবু দাউদ)

একবার কোনো এক ব্যক্তি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে জানালো, সে জনৈক আনসার মহিলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে দেখে নিয়েছো? সে বললো– না। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ

فَاذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِيْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا -

"যাও, গিয়ে তাকে দেখে এসো। কারণ আনসার মহিলাদের চোখে কিছু একটা (ত্রুটি) থাকে।"

হযরত মুগীরার বিয়ে প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمْ -

"কনেটিকে দেখে নাও। এটা তোমাদের মাঝে স্থায়ী সম্প্রীতি সৃষ্টির সহায়ক হবে।" (তিরমিযী)

প্রস্তাবিত ছেলে প্রস্তাবিত কনের অভিভাবকদের জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কনে দেখতে পারে। আর তাদের কিছু না জানিয়ে গোপনে আড়াল থেকেও দেখতে পারে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে পাত্রী দেখেছিলেন।

চ. কনের মতামত

পুরুষদের যেমন কনে বাছাই করার অধিকার আছে, অধিকার আছে পছন্দসই মেয়ে বিয়ে করার। তেমনি এ অধিকার মেয়েদেরও আছে। তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের অভিভাবক তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারেননা। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"বিধবার বিয়ে তার স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া হতে পারেনা। আর কুমারীর সম্মতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারেনা। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! তার সম্মতি কিভাবে জানা যাবে? তিনি বললেন ঃ "তার চুপ থাকাই তার সম্মতি।" (বুখারী, মুসলিম)।

পিতা কন্যার অনুমতি ছাড়াই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছেন এমন বিয়ে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেংগে দিয়েছেন, নতুবা ভাংগা বা রাখার ইখতিয়ার কন্যাকে দান করেছেন। নাসায়ী শরীফে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে ঃ

اِنَّ رَجُلاً زَوَّجَ اِبْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَاْذِنْهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

"এক ব্যক্তি তার কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিয়ে দেন। বিয়ের পর মেয়েটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে অভিযোগ দায়ের করে। তিনি তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেন।" (নাসায়ী)

ছ. বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচার করা

ইসলামে বিয়ে কোনো ঠুনকো বন্ধন নয়। বরঞ্চ একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যকার এমন এক মজবুত বন্ধন, যা তাদের একজনকে অপর জনের জন্যে হালাল করে দেয়। যেনো তেনো কারণে সে বন্ধন ভাংতে পারেনা, বাতিল হতে পারেনা।

ইসলামী সমাজে বিয়ে ব্যতিত একজন নারী ও একজন পুরুষের মিলনকে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি পরস্পরের দেখাশুনা ও মেলা-মেশাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর বিয়েই সে জিনিস, যা একজন নারী ও একজন পুরুষের জন্য এ কাজকে সম্পূর্ণ হালাল ও বৈধ করে দেয়।

ইসলাম নারী পুরুষের গোপন প্রেম এবং বন্ধুতাও সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু বিয়ের মাধ্যমে ইসলাম নারী পুরুষের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও বন্ধুতা সৃষ্টি করতে চায়।

এসব কারণেই ইসলাম গোপন ও লুকোচুরি বিয়েকে পছন্দ করেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে একটি বিরাট সামাজিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানকে ইসলাম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করার পক্ষপাতি। যে সমাজে বিয়ে হবে সে সমাজের প্রতিটি লোকের বৈবাহিক এ সম্পর্কের খবর জানা উচিত। সমাজের লোকদের এটা জানানো উচিত যে অমুক ছেলে এবং অমুক মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে যেমন খোদায়ী বিধিসম্মত হতে হবে, তেমনি তা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতও হতে হবে। এজন্যে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম বিয়ে সম্পাদনের কাজে সমাজকে সাক্ষী রাখতে চায়। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ - (ترمذى)

"এ বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার করো, তা মসজিদে সম্পাদন করো এবং ব্যাপক একতারা বাদ্য বাজাও।" (তিরমিযী)

যেহেতু ইসলামী সমাজে সব মুসলমানই মসজিদে একত্র হয়, সে জন্যেই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পাদনের কথা বলেছেন। কিন্তু মসজিদের বাইরে বিয়ের মজলিস অনুষ্ঠিত হতেও কোন দোষ নেই।

একটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ

فَهَلْ بَعَثْتُمْ جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي ؟

"তবে কি তোমরা কোনো মেয়েকে বাদ্য বাজাতে এবং গান গাইতে পাঠিয়েছো?" (নাইলুল আওতার)

বুখারী শরীফে রুবাঈ বিনতে মুয়াব্বিয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার বিয়ের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিছানার উপর এসে বসলেন, যেমন তুমি এখন আমার কাছে বসে আছো। তখন আমাদের কচি কচি বালিকারা দফ (একতারা জাতীয়) বাজাচ্ছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল গান। তারা গানে বদর যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত আমার বাপ চাচার নামে শোকগাঁথা গাইছিল। এরি মধ্যে তাদের একজন বলছিল ঃ 'আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি আগামীকাল কি হবে তা জানেন।' এ বাক্য শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "একথা বলবেনা। আগে যা বলছিলে তাই বলো।"

ইসলাম বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যাপারে ছোট্ট বালিকাদের জন্যে বাদ্য বাজানো এবং গান গাওয়াকে জায়েয ঘোষণা করেছে। তবে এমন কোনো বাদ্য বাজানো যাবেনা এবং এমন কোনো শব্দ করা যাবেনা, যা ক্ষতিকর ও প্রতিবেশীদের জন্যে বিরক্তিকর। আজকাল মাইক ও টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে অনুরূপ নির্দোষ প্রচার হতে পারে।

গানের ব্যাপারেও একই কথা। গানের ভাব ও ভাষা এমন হতে পারবেনা যা অশ্লীল ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের খিলাফ। বরঞ্চ তা হতে হবে নির্দোষ আনন্দদায়ক।

বর কনেকে সাজানোও বিয়ের অনুষ্ঠানের অংগ। বর কনেকে নতুন কাপড় চোপড় পরিয়ে আনন্দ খুশী করা জায়েয। তবে বরকে পুরুষরা এবং কনেকে মেয়েরা সাজাবে।

আজকাল আমাদের সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে ইসলামী রীতি নীতি ও সংস্কৃতির বিপরীত অনেক কিছুই সংঘটিত হয়। নারী পুরুষের মেলামেশা সহ অনেক অবৈধ কাজই অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে ইসলামী পরিবারকে সতর্ক থাকা উচিত। বিয়ের অনুষ্ঠানে সুন্নাত পন্থা অনুসরণ করা উচিত। বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন কোনো মুসলমানের জন্যেই শোভনীয় নয়।

জ. অলীমার অনুষ্ঠান

বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের একত্র করে যে শুভেচ্ছা ভোজের আয়োজন করা হয়, তাই হচ্ছে অলীমা। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভোজের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ইসলামে বিয়ে হচ্ছে ব্যাপক প্রচারধর্মী অনুষ্ঠান। কোনো বিয়েকে প্রচারমুখী করার জন্যে এ ভোজ অনুষ্ঠান খুবই কার্যকরী।

বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, মদীনায় হিজরত করে আসার পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ একজন আনসার মহিলাকে বিয়ে করে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ শুভসংবাদ প্রদান করেন। শুনে তিনি বললেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

"আল্লাহ তোমার দাম্পত্য জীবনে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও তুমি এখন অলীমার ব্যবস্থা করো।"

বুখারী শরীফের আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, যয়নব বিনতে জহশকে বিয়ে করার পর রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরী যবাই করেন। অলীমা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন, এ ভোজ অনুষ্ঠানের পর কিছুলোক দীর্ঘক্ষণ ধরে হুজুরের ঘরে বসে গল্প গুজব করতে থাকে। এতে তিনি বিরক্তি অনুভব করেন, যদিও লজ্জার খাতিরে তাদের কিছু বলতে পারছিলেননা। অতপর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। এক সফরকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। তাতেও তিনি সকল সঙ্গী সাথীদের দাওয়াত দিয়ে সামর্থানুযায়ী অলীমার ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত আলীর সঙ্গে হযরত ফাতিমার বিয়ের কথাবার্তা সম্পন্ন হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ "এ বিয়েতে অবশ্যই অলীমার ব্যবস্থা করতে হবে" (মুসনাদে আহমদ)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করে অলীমার ভোজের ব্যবস্থা করেননি এমন ঘটনা আমার জানা নেই।"

অলীমার যিয়াফত অনুষ্ঠান করা বর পক্ষের জন্যে সুন্নাত। তবে কনে পক্ষও এরূপ অনুষ্ঠান করতে পারে। অনুষ্ঠান করতে হবে সামর্থ্য অনুযায়ী। ভোজে খাবার ব্যবস্থাও করতে হবে সামর্থানুযায়ী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কখনো গোশত দ্বারা অলীমার ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার কখনো কেবলমাত্র খেজুর দ্বারা। সামর্থ্যের বাইরে প্রদর্শনীর জন্যে ব্যয়বহুল ভোজের ব্যবস্থা করা ইসলামী নীতির খিলাফ।

অলীমার ভোজে ধনী দরিদ্র সকলকেই দাওয়াত করতে হবে। কেবল মুখ দেখে দেখে ধনীক শ্রেণীর লোকদের দাওয়াত দেয়া নাজায়েয। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ -

"নিকৃষ্টতম ভোজ হলো সেই অলীমার ভোজ, যেখানে কেবল ধনী লোকদেরই দাওয়াত দেয়া হয়, আর বাদ দেয়া হয় গরীব লোকদের।" (বুখারী, মুসলিম)

আজকাল আমাদের সমাজে অনেকে উপহার উপঢৌকন পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভোজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে। আর সে জন্যে যাদের নিকট থেকে তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় কেবল তাদেরই দাওয়াত দেয়া হয় আর যারা গরীব এবং উপহার উপঢৌকন দেয়ার মতো সামর্থ্য রাখেনা তাদের বাদ দেয়া হয়। এরূপ উদ্দেশ্য এবং এরূপ বৈষম্যমূলক দাওয়াত কিছুতেই ইসলামসম্মত হতে পারেনা। উপরোক্ত হাদীসই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এরূপ ভোজে সামর্থবান নন এমন দু'চারজনকে দাওয়াত দেয়া হলেও কোনো উপহার উপঢৌকন দিতে পারবেনা বলে তারা তাতে শরীক হতে পারেনা। সুতরাং এ ধরনের কুপ্রথা ঈমানদার লোকদের জন্যে সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

অলীমার ভোজ অনুষ্ঠানের দাওয়াত পাওয়ার পর তাতে যোগদান করা মুসলমানদের কর্তব্য। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيَجِبْ -

"তোমাদের কাউকেও যদি কোনো বিয়ের অলীমায় দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেনো তা কবুল করে তাতে উপস্থিত হয়।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

হাদীস থেকে একথাও জানা যায়, দাওয়াত পাওয়ার পর অলীমার ভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়াকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনঃ মোহর ও যৌতুক

ক. মোহর কি?

বিয়ে হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যকার শরয়ী বন্ধন (عقد) আর বিয়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে মোহর। যেমন করে সূর্যোদয় না হলে দিন হয়না, তেমনি করে মোহর নির্ধারণ ছাড়া বিয়ে হয়না। ইসলাম মোহরকে স্ত্রীর যৌনাংগ হালাল হবার 'বিনিময়' বলে ঘোষণা করেছে।

বলা হয়েছে ঃ

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ ـ(النساء : ٢٤)

"নিজেদের সম্পদের 'বিনিময়ে' তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ২৪)

হাদীসে রসূলে মোহরের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ (مسند احمد)

"(মোহর হচ্ছে সে জিনিস) যার বিনিময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুপ্তাংগ হালাল করে নাও।" (মুসনাদে আহমদ)

খ. মোহরের গুরুত্ব ও মর্যাদা

উপরের আলোচনা থেকে মোহরের গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গেছে। বস্তুত, মোহর বিয়ের জন্যে এমন একটি শর্ত যা ছাড়া বিয়েই হতে পারেনা। মোহর পরিশোধ করাকে কুরআন মজীদে অপরিহার্য ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ـ(النساء: ٢٤)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করো তার বিনিময়ে অপরিহার্য ফরয হিসেবে তাদের মোহর পরিশোধ করো।" (সূরা নিসা ঃ ২৪)

ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয করে দিয়েছে। মোহরকে স্ত্রীর নিকট থেকে স্বাদ গ্রহণ করার 'বিনিময়' ঘোষণা করেছে। কেউ যদি স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করবেনা বলে ভাবে, তবে সে যিনাকারী– ব্যভিচারী। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায়

ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِصِدَاقٍ وَنَوٰى اَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ- (مسند احمد)

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে মোহর দানের শর্তে বিয়ে করেছে, অথচ নিয়্যত করেছে মোহর পরিশোধ না করার, তবে সে যিনাকারী– ব্যভিচারী।"

বস্তুত, মোহরানা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোনো প্রকার দান নয়। বরং এটা স্ত্রীর আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। স্বামী তার এ অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারেনা। এমনকি মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত নিজেকে স্বামী থেকে দূরে রাখার অধিকার ইসলামী শরীয়ত নারীকে প্রদান করেছে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহরের কিছু না কিছু অংশ স্ত্রীর হাতে না দিয়ে তার নিকট (সহবাসে) যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) কুরআন হাদীসের আলোকে মোহরের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"কুরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের যে অধিকার লাভ করে মোহর হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার 'বিনিময়'।" কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ- (النساء)

"এদের ছাড়া আর যতো নারী আছে, নিজেদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।" (সূরা নিসা)

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً-

"আর (দাম্পত্য জীবনে) তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করো, তারি বিনিময়ে একটি অবশ্য কর্তব্য ফরয হিসেবে তাদের মোহর পরিশোধ করো।" (সূরা নিসা রুকু ঃ ৪)

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ-

"আর তোমরা কি করে সে অর্থ ফেরত নিতে পারো যখন তোমরা একজন আরেক জনের সঙ্গে যৌন স্বাদ আস্বাদন করেছো?" (সূরা নিসা রুকূ ঃ ৩)

এ আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, মোহরই হচ্ছে সেই জিনিস যার বিনিময়ে স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামীতের্ব অধিকার লাভ হয়ে থাকে। রসূলে করীমের এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিষয়টাকে আরও পরিস্কার করে তোলে।

সিহাহ সিত্তাহ, দারমী ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَحَقَّ الشُّرُوطِ اَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ -

"বিয়েতে পূরণ করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে শর্তটি, তা হচ্ছে যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীদের লজ্জাস্থান হালাল করে নাও।"

লেয়ানের সেই মোকদ্দমাহ যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ঃ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর স্বামী আবেদন করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার অর্থসম্পদ আমাকে ফেরত দেয়া হোক। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ

لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَالِكَ اَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا - (مسلم)

"সম্পদ ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই। তুমি যদি তার বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ এনে থাকো, তবে তুমি যে তার গোপন অংগ হালাল করে নিয়েছিলে তার বিনিময়ে তা পরিশাধ হয়ে গেছে। আর তুমি যদি তার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ (অপবাদ) আরোপ করে থাকো তবে তো সম্পদ ফেরত নেয়ার দাবি করা আরও বিদূরিত হয়ে গেছে।" বিষয়টি এর চাইতেও পরিষ্কার ভাষায় অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে হাদীসটি মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصَدَاقٍ وَ نَوٰى اَنْ لَا يُوَدِّيَهِ فَهُوَ زَانٍ -

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে মোহর দানের শর্তে বিয়ে করেছে, অথচ নিয়্যত করেছে মোহর পরিশোধ না করার, তবে সে ব্যভিচারী।"

এসব দলীল প্রমাণ থেকে মোহরের যে মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, মোহর কোনো সামাজিক ও প্রদর্শনীমূলক জিনিস নয়। বরঞ্চ মোহর হচ্ছে সে জিনিস যার বিনিময়ে একজন নারী একজন পুরুষের জন্যে হালাল হয়ে যায়। আর কুরআন হাদীসের এসব প্রামাণ্য দলীলের দাবী এটাই যে, স্ত্রীর গুপ্তাংগ হালাল করার সাথে সাথেই পূর্ণ মোহর পরিশোধ করা ওয়াজিব। তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই যদি বিলম্বে পরিশোধের কোনো

সমঝোতা হয়ে যায়, কেবল সে ক্ষেত্রেই বিলম্বে পরিশোধ করা যাবে।" [১]

গ. দেন মোহর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?

দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার। তা পরিশোধ করা স্বামীর দায়িত্ব। স্বামী তার এ গুরুদায়িত্ব পালনে গড়িমসি করার তো প্রশ্নই উঠেনা। বরঞ্চ ইসলাম তাকে মনের সন্তোষ সহকারে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۔ (النساء: ٤)

"মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা পরিশোধ করে দাও।" (সূরা নিসা ঃ ৪)

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বিয়ের পর স্ত্রীর গুপ্তাংগ হালাল করার সময়ই তার প্রাপ্য মোহর পরিশোধ করে দেয়া উচিত। কিন্তু স্বামী একত্রে সব মোহর পরিশোধ করতে না পারলেও বাসর রাত্রে মোহরের একটা অংশ অন্তত পরিশোধ করা উচিত। আর বাকীটার ব্যাপারে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে। এ ব্যাপারে মওলানা মওদূদী (রঃ) বলেন ঃ

'মোহরের দাবী হচ্ছে, তা গুপ্তাংগ হালাল করার ক্ষণেই পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের ব্যাপারে স্বামীকে কিছুটা অবকাশ দেয়াটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একটা মেহেরবানী মাত্র। আর অবকাশের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার চুক্তি বা সমঝোতা না হয়ে থাকলে স্ত্রী যখন ইচ্ছা আংশিক বা পূর্ণ মোহর দাবী করতে পারবে।' [২]

স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহরের অংশবিশেষ বা পূর্ণ মোহর মাফ করে দিতে পারে এবং স্বামী সানন্দে তা গ্রহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۔

"স্ত্রীরা যদি সানন্দে মোহরানার কিছু অংশ তোমাদের মাফ করে দেয়, তবে তোমরাও তা সানন্দে গ্রহণ করতে পারো।" (সূরা নিসা ঃ ৪)

তবে হাদীস থেকে জানা যায়, কিছু মোহর স্ত্রীর হাতে না দিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করা অবাঞ্ছনীয়। মোহর সম্পর্কে ইসলামের বিধান হচ্ছে ঃ

১. মোহরকে ফরয মনে করে পরিশোধ করতে হবে।

---

১. রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খণ্ড ঃ ফিকহী মাসায়েল অধ্যায়।

২. রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খণ্ড ঃ ফিকহী মাসায়েল অধ্যায়।

২. মোহর পরিশোধ করতে হবে সানন্দে সন্তোষ সহকারে।

৩. বাসর রাত্রেই মোহর পরিশোধ করা উচিত।

৪. স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহর পরিশোধের জন্য স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে।

৫. স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে পূর্ণ বা আংশিক মোহর মাফ করে দিতে পারে।

৬. বাসর রাত্রে কিছু না কিছু মোহর স্ত্রীকে প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

৭. ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, মোহরের দাবী প্রত্যাহার করে নেয়ার পর স্ত্রী যদি পূনরায় তা দাবী করে তবে স্বামী তা পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

৮. মোহর নগদ অর্থ এবং দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমেও দেয়া যায়।

ঘ. মোহরের পরিমাণ

মোহর সম্পর্কে আমরা এযাবত যা কিছু আলোচনা করলাম তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মোহর কোনো খেল তামাশার ব্যাপার নয়। মোহরের বিষয়টাকে হালকাভাবে নেয়ার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। মোহর স্ত্রীকে হালাল করার অপরিহার্য বিনিময়। মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য ফরয। এ ফরয আদায়ের ব্যাপারে স্বামীর জন্য কোনো প্রকার গড়িমসি ও বাহানা খোঁজার অবকাশ নেই। এ জন্যে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে এমন পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করতে হবে যা পরিশোধ করা স্বামীর জন্যে দুঃসাধ্য না হয়।

ইসলাম মোহরের বিশেষ কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়নি। কারণ সকল মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এক রকম নয়। মোহরের পরিমাণ স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। স্বামী যদি দরিদ্র অসচ্ছল হন, তবে তিনি যে পরিমাণ পরিশোধ করতে সক্ষম তার বিয়েতে সে পরিমাণ মোহরই নির্ধারিত হওয়া উচিত। মদীনায় হিজরাত করার পর সাহাবায়ে কিরাম যখন দারুণ অসচ্ছল অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন, তখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ নিঃস্ব একজন সাহাবীর নিকট কুরআন জানার বিনিময়ে একটি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন ঃ

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ - (مسند احمد)

"কুরআনের যা কিছু তোমার জানা আছে, তা স্ত্রীকে শিক্ষা দেবে এরি বিনিময়ে আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।"

আরেকজন গরীব সাহাবীকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছিলেন ঃ اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ -

"মোহরানা বাবদ তাকে কিছু দিতে চেষ্টা করো, তা যদি একটি লোহার আংটিও হয়।"

অপরদিকে সামর্থবানরা যারা অধিক দিতে সামর্থ্য রাখেন তারা মোহরের পরিমাণ বেশি নির্ধারণ করতে পারেন। স্ত্রীর দাবী অনুযায়ী অধিক পরিমাণে মোহর দিতে রাজী হতে পারেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا ، فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا - (النساء: ٢٠)

"তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছে করে থাকো, তবে তাকে রাশি রাশি সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবেনা।" (সূরা নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতে রাশি রাশি সম্পদ দেয়ার কথা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সামর্থবান হলে স্বামী স্ত্রীকে অধিক পরিমাণ মোহর দিতে পারে।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে জানা গেলো মোহরের সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। তা কমও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। আর এ কম বেশি হতে হবে স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর মর্যাদার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ - (ابوداود حاكم)

"সর্বোত্তম পরিমাণের মোহর হচ্ছে তা, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য।"

ঙ. মোহরানা ও বর্তমান মুসলিম সমাজ

জাহেলী যুগে মোহরানা নিয়ে কন্যা পক্ষ ও বর পক্ষের মধ্যে দর কষাকষি চলতো এবং অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারিত হতো। অবশেষে মোহর আদায় করা নিয়ে শুরু হতো নানারূপ জটিলতা ও ঝগড়া ঝাটি।

আমাদের আজকের সমাজের অবস্থাও অনেকটা তাই। মুসলমান সমাজে মোহরের প্রকৃত গুরুত্ব ও মর্যাদা আর বাকি নেই। এখন এটা স্রেফ একটা রসমে পরিণত হয়েছে। মুসলমানরা এখন এটাকে একটা প্রথাগত ব্যাপার মাত্র মনে করে। সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হচ্ছে। কন্যা পক্ষ বিরাট অংকের মোহর দাবী করে। তারা এটাকে হয়তো সামাজিক মান মর্যাদার

বাহন মনে করে নয়তো তালাকের প্রতিবন্ধক হিসেবে এরূপ দাবি করে থাকে। অপরদিকে বর পক্ষও অধিক মোহর নির্ধারণকে মর্যাদাকর মনে করে থাকে। অথচ ইসলামে মোহরের সাথে মান মর্যাদা ও তালাকের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। ইসলামে এটা স্ত্রীর বিশেষ অংগ হালাল করার অপরিহার্য বিনিময়। এটা আদায় করা স্ত্রীর অধিকার আর প্রদান করা স্বামীর দায়িত্ব। সুতরাং সামাজিক মান মর্যাদা ও তালাকের সঙ্গে এর কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকতেই পারেনা।

শুধু এতটুকুই নয়, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে মোহর পরিশোধ করার কোনো নিয়্যতই থাকেনা। এটাকে স্রেফ একটা প্রদর্শনীমূলক প্রথা বিশেষ মনে করা হয়। এটা পরিশোধ করার কোনো ধারণা বরের থাকেনা। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَيُّمَا رَجُلٍ اَصْدَقَ اِمْرَاَةً صَدَاقًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُرِيْدُ اَدَاءَهُ اِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللّٰهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ -

"যে ব্যক্তি কোনো একটা পরিমাণ মোহরানা ধার্য করে কোনো নারীকে বিয়ে করলো, অথচ আল্লাহ জানেন তা পরিশোধ করার ইচ্ছে তার নেই, এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে তার স্ত্রীকে প্রতারিত করলো এবং নাহকভাবে তার গুপ্তাংগ নিজের জন্যে হালাল মনে করে তা ভোগ করলো। এমন ব্যক্তি কিয়ামতে 'যিনাকারী' ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

অনুরূপ হাদীস পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কন্যা পক্ষের মনে রাখা দরকার, ছেলের সামর্থ্যের বাইরে অধিক পরিমাণ মোহর ধার্যের চাপ তার উপর প্রয়োগ করা উচিত নয়। অপর পক্ষে ছেলেকেও সামর্থ্যের বাইরে অধিক পরিমাণ মোহর ধার্য করার ব্যাপারে একমত হওয়া ঠিক নয়। কারণ প্রদর্শনীমূলক মোহর ধার্য করা, মোহরকে মান মর্যাদার বাহন ও তালাকের প্রতিবন্ধক মনে করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ খেলাফ। বর্তমান সমাজের মোহর সংক্রান্ত একটা চিত্র মাওলানা মওদূদী (রঃ) অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"এ দেশের মুসলমানরা সাধারণত দেন মোহরকে একটা প্রথাগত জিনিস মাত্র মনে করে। কুরআন হাদীসে মোহরের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে তার সে গুরুত্ব অবশ্যই নেই। বিয়ের সময় সম্পূর্ণ প্রদর্শনীমূলকভাবে মোহরের চুক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এ চুক্তি কার্যকর করার কোনো চিন্তাই তাদের

মস্তিষ্কে থাকেনা। মোহরের বিষয় আলোচনাকালে আমি নিজ কানে বহুবার একথা শুনেছি ঃ "আরে মিঞা! মোহর দেয়ই বা কে আর নেয়ই বা কে!" এ যেনো কেবল একটা ফরয পূরণের জন্যেই ধার্য করা হয়। আমার জানা মতে শতকরা আশিটি বিয়ে এরূপ হয়ে থাকে যেগুলোতে কখনো মোহর পরিশোধ করা হয়না। লোকেরা কেবল তালাকের প্রতিবন্ধক হিসেবেই মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। এভাবে কার্যত নারী সমাজের শরীয়তপ্রদত্ত একটি পাকাপোক্ত অধিকারকে বিলুপ্ত করা হলো। একথার কোনো পরোয়াই করা হয়না যে, যে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ লোকেরা নারীদেরকে পুরুষদের জন্যে বৈধ করে নেয় সে শরীয়তই মোহরকে নারীর যৌনাংগ হালাল করার জন্যে 'বিনিময়' বলে ঘোষণা করেছে। আর এ বিনিময় পরিশোধ করার নিয়্যত না থাকলে খোদার নিকট পুরুষের জন্যে স্ত্রী হালালই হয়না।"[৩]

চ. যৌতুক

আরবী (جهاز) শব্দটি বাংলায় যৌতুক শব্দরূপে ব্যবহার হয়ে আসছে। এটা এক প্রকার দান বিশেষ। এ দান বিয়ের জন্যে শর্তও নয়, এবং বিয়ের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশও নয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাকে বিয়ের শর্ত হিসেবে পেশ করা হয়। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ দাতা এবং দান লাভের পাত্র পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। তাই বিষয়টি নিয়ে দু'চার কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।

হাদীস থেকে জানা যায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমাকে হযরত আলীর নিকট বিয়ে দেবার পর কন্যাকে কতিপয় ব্যবহার্য সামগ্রী যৌতুক হিসাবে দান করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে ১. একটা পাড়ওয়ালা কাপড় ২. একটি পানির পাত্র ৩. একটা চামড়ার বালিশ ৪. যাঁতা ৫. মাটির পাত্র ইত্যাদি।

যেহেতু বিয়ের পর কন্যা একটি নতুন পরিবেশে যাচ্ছে এবং একটি নতুন সংসার গড়ে তোলোর দায়িত্ব নিচ্ছে, সে হিসেবে নতুন সংসার গড়ার সূচনালগ্নে পিতা বা অভিভাবক কন্যাকে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য কিছু সামগ্রী দান করাকে ইসলাম জায়েয রেখেছে। আর এরূপ কিছু করা আদরের কন্যার জন্যে স্নেহময় পিতার মনের আকাঙ্খাও থাকে।

কিন্তু এ ব্যাপারে সামর্থ্যের বাইরে প্রদর্শনীর জন্যে কিছু দান করা ইসলাম

---

৩. রাসায়েল ও মাসায়েল প্রথম খণ্ড, ফিকহী মাসায়েল অধ্যায়।

কন্যার অভিভাবকের জন্যে বাঞ্ছনীয় মনে করেনা। এ ব্যাপারে তিনি যা করবেন তা কেবল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ীই করবেন। কারো চাপে পড়ে কিছু দান করা যেমন তার উচিত নয়, তেমনি এটাকে মান মর্যাদার কারণ মনে করে দান করাও উচিত নয়। তার সামর্থ্য থাকলে তিনি অবশ্যই কন্যাকে দান করতে পারেন। কিন্তু তাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

আজকাল বর পক্ষ কন্যা পক্ষের নিকট যৌতুক দাবী করে আদায় করে। এমন কি বর পক্ষ থেকে যৌতুককে বিয়ের শর্ত হিসাবে আরোপ করার জঘন্য রীতি প্রচলিত হয়েছে। এটা কিছুতেই ইসলাম সমর্থিত নয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী বরই কন্যার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। কনের যা কিছু প্রয়োজন বরই তা খরচ করবে। বরের জন্য খরচ করার কোনো বিধান নেই।

ইসলাম যেসব কারণে স্বামীকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব ও মর্যাদা দান করেছে, সে সম্পর্কে কুরআন পাক বলে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

"পুরুষ নারীদের পরিচালক কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপর জনের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ কারণেও যে, পুরুষ (স্ত্রীর জন্যে) তার অর্থ সম্পদ ব্যয় করে।" (নিসা ঃ ৩৪)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব স্বামীর। আর এ খরচ করার কারণেই তাকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্বশালী– পরিচালক বানানো হয়েছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, সে কালের হিন্দু সমাজের মতো মুসলমানদের মধ্যেও আজকাল যৌতুক একটা ব্যাধি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বর পক্ষ থেকে শর্ত দিয়ে দাবী করে যৌতুক আদায়ের চেষ্টা করা হয়। অথচ যৌতুক দাবী করার কোনো অধিকার ইসলাম বরকে দেয়নি। আর যৌতুককে বিয়ের শর্ত বানিয়ে নেয়াটা তো এমন মারাত্মক নৈতিক অধঃপতন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না।

সর্বদিক দিয়ে কোনো মেয়েকে পছন্দ করার পর মেয়ের অভিভাবক কেবল যৌতুকের শর্ত পূরণ করতে না পারায় ছেলে উক্ত মেয়েকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে এমনটি আজ অহরহ ঘটছে। যৌতুক দাবী করার এ অধিকার পুরুষদের কে দিলো? বিয়ের জন্যে কোনো মুসলমান এমন অন্যায় ও অশোভনীয় শর্তারোপ করতে পারেনা। যৌতুক দাবী করার কোনো বিধান ইসলামে নেই। এটা সরাসরি এক বিরাট যুলম। কন্যার নতুন সংসারে কিছু ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী

প্রদান করাটা একান্তই পিতার ইচ্ছা ও আন্তরিকতার ব্যাপার। আর এমনটি তিনি ইচ্ছা করলেও তা দেবেন তাঁর সমার্থ্য অনুযায়ী, কোনো অবস্থাতেই কারো দাবী অনুযায়ী নয়।

এরূপ যৌতুক প্রথা মুসলমানদের জন্যে একটা অভিশাপ, একটা যুল্‌ম ও একটা ধ্বংসাত্মক রীতি। এর ফলে কতো দাম্পত্য জীবন ভেংগে চূরে খান খান হয়ে গেছে। কতো মধুর আবেশ বিষাদে পরিণত হয়েছে। আর অকালে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে কতো নারীর। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাতেই দেখা যায় যৌতুকের বিভীষিকাময় তাণ্ডব লীলা।

মুসলিম সমাজকে এ অভিশাপ থেকে বাঁচতে হবে। রেহাই পেতে হবে প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে এ যুল্‌ম ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে। তাই প্রতিটি মুসলিম নর নারীর উচিত এর বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া।

চার ঃ ইসলামের দাম্পত্য জীবন

মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুখ শান্তির বেশির ভাগই নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির উপর। তাই সুন্দর ও আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব। বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। এ জীবনে তারা একজনের উপর আরেকজন কিছুটা অধিকার লাভ করে। একজনের প্রতি আরেকজনের উপর অর্পিত হয় কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। দাম্পত্য জীবনকে সুখী সমৃদ্ধশালী করার জন্যে তাদের দু'জনই দু'জনের উপর সে অধিকার লাভ করবে যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রত্যেককে দান করেছেন। তাদের উভয়কে উভয়ের প্রতি সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করতে হবে যা ইসলামী শরীয়ত তাদের উপর অর্পণ করেছে। সর্বোপরি তাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের থাকতে হবে নিষ্কলুষ আন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম ও ভালোবাসা এবং আবেগ উদ্দীপ্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

ক. স্বামী স্ত্রীর চিরস্থায়ী সম্পর্ক

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান মোতাবেক যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা কোনো প্রকার ঠুনকো অস্থায়ী সম্পর্ক নয়। বরঞ্চ এ এক চিরস্থায়ী শাশ্বত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনকে ছাড়িয়ে আখিরাতের জীবনেও স্থায়ী হয়। বস্তুত পক্ষে, ঈমান ও আমলের দিক থেকে স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি প্রকৃত মুসলমান হতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে একত্রে জান্নাতে বসবাসেরও সৌভাগ্য দান করবেন। জান্নাতে ঈমানদার লোকদের যেসব নিয়ামত প্রদান করা হবে সেগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআন মজীদের একস্থানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔

"তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে বানিয়ে দেবো কুমারী; স্বামীদের প্রতি আসক্ত আর বয়েসে সমকক্ষ।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩৫-৩৭)

অবশ্য এ সম্পর্ক কেবল তখনই আখিরাতের জীবনেও স্থায়ী হবে, যখন স্বামী স্ত্রী উভয়ই মুত্তাকী হবে এবং উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। সূরা যুখরুফের একটি

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ -

"দুনিয়ায় যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল, পরকালে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকীরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবে।" (আয়াত ঃ ৬৭)

আখিরাতের জীবন পর্যন্ত নিজেদের জীবনকে চিরস্থায়ী করার প্রবল আকাঙ্খা ও ঐকান্তিক বাসনা প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীরই থাকা উচিত। আর এ সম্পর্কের চিরস্থায়ীত্বের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার শর্তারোপ করেছেন। তাই এ পরম সৌভাগ্য লাভ করার জন্যে প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীরই তাকওয়ার যিন্দেগী যাপন করা উচিত। নিষ্কলুষ ঈমান, ঐকান্তিক আমল এবং প্রতিনিয়ত পরম পরাক্রমশীল খোদা তা'আলার ভয়ে ভীত থাকার মাধ্যমেই এ মহৎ গুণটি অর্জন করা সম্ভব।

খ. দাম্পত্য জীবনে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে যে জৈবিক কামনা বাসনা দান করেছেন, তা চরিতার্থ করার মানবোচিত পন্থা হচ্ছে বিয়ে। কিন্তু বিয়ে মানব জীবনে কেবল যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ করার সম্পর্কই নয়, বরঞ্চ আল্লাহ তা'আলা এটাকে মানুষের জন্যে তার এক বিরাট নিয়ামত প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কের ফলে তারা একে অপরের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়ে যায়। এ সম্পর্কের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে শান্তি, আরাম ও আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত কুরআনের বাণীর প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, আন্তরিকতা, হৃদ্যতা এবং শান্তি ও আনন্দকে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً - (الروم: ٢١)

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তার নিকট শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা, দয়া ও করুণা সঞ্চার করে দিয়েছেন।" (সূরা রূম ঃ ২১)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ (الاعراف : ١٨٩)

"তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ! যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি, যেনো সে তার নিকট থেকে পরম শান্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করতে পারে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৯)

অন্যত্র স্বামী স্ত্রীর একজনকে আরেকজনের পোষাক ও আচ্ছাদন বলে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ

"তারা (স্ত্রীরা) হচ্ছে তোমাদের পোষাক আর তোমরা হলে তাদের আচ্ছাদন।" (সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৭)

অর্থাৎ পোষাক যেমন মানুষের শরীরের সাথে মিশে থাকে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কও এরকম মিলে মিশে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার সম্পর্ক। পোষাক যেমন মানুষের দেহকে বাইরের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করে, স্বামী স্ত্রীও পরস্পরের জন্যে তাই। তারাও পরস্পরকে হেফাজত ও সংরক্ষণ করে।

স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি এ চরম আকর্ষণ ও পরম ভালোবাসাকে কুরআন মজীদ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ـ (ال عمران : ١٤)

"আনন্দদায়ক ও মনঃপূত জিনিসের ভালোবাসা মানুষের জন্যে সৌন্দর্যের প্রতীক করে দেয়া হয়েছে, যেমন নারী...।" (আলে ইমরান ঃ ১৪)

সত্যিই, স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসা ছাড়া কিছুতেই মানব জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারতনা; বরঞ্চ সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হতো নিরেট একটা পাশবিক সম্পর্ক। বস্তুত, কালামে পাকের এসব ভাষ্য অনুযায়ী মানুষের দাম্পত্য জীবনটাই হচ্ছে প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার জীবন।

হাদীসে রসূলেও দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরম মধুময় সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর স্ত্রীদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মৃত স্ত্রী হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা উঠলে রসূলে করীমের এমন হৃদয়াবেগ দেখা দিতো যে তিনি কখনো কেঁদে ফেলতেন। যখনই কোনো বকরী যবাই করতেন হযরত খাদীজার আত্মীয়স্বজনকে অবশ্যই সেখান থেকে কিছু অংশ পাঠাতেন। মৃত খাদীজার কোনো সখি তাঁর ঘরে এলে তিনি পরম আনন্দিত হতেন। একবার রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল খানায় গোসল

করছিলেন। এমন সময় হযরত খাদীজার বোন 'হালা' ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রসূলে খোদা কোথায়? তার আওয়াজ শুনতে পেয়ে রসূলে খোদা গোসল খানা থেকেই বলে উঠলেন ঃ اَللّٰهُمَّ هَالَةَ আয় আল্লাহ্, হালা! হালার কণ্ঠস্বর ছিলো খাদীজারই মতো। এতে করে বুঝা যায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজাকে কতো বেশি ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর সকল স্ত্রীকেই অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁরাও তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্যে প্রবল হৃদয়াবেগের সাথে অপেক্ষা করতেন। তাঁকে তাঁরা ভালোবাসতেন তাঁদের জীবনের চাইতেও বেশি করে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকেও দাম্পত্য জীবনে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার তাকীদ করতেন। নব দম্পতির জন্যে তিনি এভাবে দোয়া করতেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ-

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বরকত দিন। তোমাদের দুজনের দাম্পত্য জীবনে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন আর তোমাদের মধ্যে কল্যাণের সম্পর্ক দান করুন।" (আবু দাউদ)

গ. স্বামীর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব

ইসলামী জীবন বিধান দাম্পত্য জীবনের যে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাতে পুরুষকে কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -(النساء: ٣٤)

"পুরুষরা নারীদের পরিচালক– কর্তা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে একজনের উপর আরেকজনকে মর্যাদা দান করেছেন এবং পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -(البقرة: ٢٢٨)

"স্ত্রীদের উপর পুরুষদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।"

আয়াতদ্বয় থেকে পরিষ্কার হলো যে, স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর অভিভাবক, কর্তা, পরিচালক ও দায়িত্বশীল। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর উপর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছে যে, সে যদি যথার্থভাবে আল্লাহ ও রসূলের

বিধান অনুযায়ী তার কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ - (بخارى)

"পুরুষ তার স্ত্রী পরিজনের পরিচালক এবং এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে।" (বুখারী)।

ইসলাম স্ত্রীর উপর স্বামীকে যে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছে, সে সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় লিখেছেন ঃ

"স্ত্রীর উপর স্বামীকে কর্তা ও পরিচালক নিযুক্ত করাটা অবশ্য জরুরী কাজ। আর এ প্রাধান্যটা একটা প্রকৃতিগত ব্যাপারও বটে। কারণ পুরুষ অধিক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন। শাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে অধিকতর দক্ষ। সাহায্য সহযোগিতার কাজে দৃঢ়তাসম্পন্ন। অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ ও অশ্লীল কাজ প্রতিরোধের কাজে সে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। তাছাড়া পুরুষ স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেও কর্তৃত্বশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

প্রথমোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লামা মওদূদী (রঃ) লিখেছেন ঃ

"পুরুষদেরকে প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা দান করেছেন যা নারীদের দেয়া হয়নি বা অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। এ কারণে পারিবারিক সংস্থায় পুরুষই ব্যবস্থাপক হবার যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে নারীদেরকে প্রকৃতিগতভাবেই এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে দাম্পত্য জীবনে পুরুষদের হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের অধীন হয়ে থাকাই তাদের বাঞ্ছনীয়।" [১]

ঘ. স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর উপর স্বামীর বহুবিধ অধিকারের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর যে কতো বড় অধিকার রয়েছে তা একটি হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়। হাদীসটি হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

لَوْ جَازَ لِاَحَدٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا - (منهاج القاصدين)

১. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা নিসা, টীকা-৫৮।

"একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষকে সিজদা করা যদি জায়েয হতো, তবে আমি স্বামীদেরকে সিজদা করার জন্যে নারীদেরকে নির্দেশ দিতাম।"

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সমূহের মধ্যে ২টি অধিকার মৌলিক ঃ

১. গোপন বিষয়সমূহের হিফাযত

স্ত্রীর উপর স্বামীর একটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে, সে স্বামীর গোপন বিষয়সমূহ হিফাযত করবে, যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করবে। স্বামীর যাবতীয় আমানত রক্ষা করবে। স্বামীর কোনো গোপনীয়তা কখনো প্রকাশ করবেনা, স্বামীর সম্মানহানি করবেনা। স্বামীর জন্যে অমর্যাদাকর হবে এমন কোনো কথা কোথাও বলবেনা। কোনো অবস্থাতেই স্বামীর কোনো আমানতের খিয়ানত করবেনা। স্বামীর অনুপস্থিতে তার নিজেকে পূর্ণ হিফাযত করবে। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ـ

"পুণ্যবতী নারীরা হয়ে থাকে স্বামীর অনুগত অনুরক্ত আর আল্লাহর অনুগ্রহে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার গোপনীয় বিষয়ের হিফাযতকারী।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা মওদূদী (রঃ) তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন ঃ "হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সেই স্ত্রী যাকে দেখলে তোমার মন খুশী হয়। যাকে কোনো কাজ করতে বললে সে তা মেনে নেয়। তুমি যখন ঘরে অনুপস্থিত থাকো তখন সে তোমার ধন সম্পদ ও তার নিজেকে হিফাযত করে। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের সুন্দরতম ব্যাখ্যা পেশ করে।"[২]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় মওলানা অন্যত্র লিখেছেন ঃ "এখানে গোপনীয় বস্তু বলতে সে জিনিসকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর কেবল স্বামীরই একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং তার অনুপস্থিতিতে আমানত স্বরূপ স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত থাকে। এ গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বংশ সংরক্ষণ, বীর্যপালন, ইযযত রক্ষা ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা। মোটকথা, এর মধ্যে এ সব কিছুই এসে যায়। এগুলোর পূর্ণ সংরক্ষণ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার।"[৩]

---

২. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা নিসা, টীকা-৫৯।

৩. হকুকুয যাওজাইন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

একটি হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্রের নারীর গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَ اِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَ مَالِهَا ـ (ابن ماجه)

"(সে এমন নারী) যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজ সত্তার ও স্বামীর অর্থসম্পদের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণকামী হয়।" (ইবেনে মাজাহ্)

এ ছাড়া স্বামীর দাম্পত্য জীবনের কোনো গোপন কথাও স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই কারো নিকট প্রকাশ করতে পারবেনা।

২. আনুগত্য ও খেদমত লাভের অধিকার ঃ

স্বামীর আরেকটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য ও খেদমত করবে। সে হবে পূর্ণ স্বামীগতপ্রাণ। তার আচার আচরণ হবে কোমল ও বিনয়ী, কথা বার্তায় হবে সে নম্র ভদ্র, স্বামীর নির্দেশ পালনে থাকবে সদা প্রস্তুত আর স্বামীর খেদমতের জন্যে থাকবে সদা পাগলপারা। মোটকথা, বিনয়, আনুগত্য ও স্বামীর খেদমত হবে তার ভূষণ। স্বামীর এ অধিকারটি সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ـ (النساء)

"সতী সাধ্বী নারীরা একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

সতী পুণ্যবতী নারীদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরশাদ করেছেন ঃ

وَ تُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ ـ

"স্বামী যখনই কোনো কাজের আদেশ করে সে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে। অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ اَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ـ

"নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে আর স্বামীর আনুগত্য করে, তবে অবশ্যই জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সে প্রবেশ করতে পারবে।"

আরেকটি হাদীসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তাকওয়ার পর মুমিনের সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে নেক স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে।" (তিরমিযী)

বস্তুত, আনুগত্য লাভ স্বামীর এমন একটি অধিকার, যে অধিকার ক্ষুণ্ন হলে দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হতে পারেনা। তাই ইসলামী শরীয়ত স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে থাকাকে স্ত্রীর উপর অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে। তবে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের খেলাফ স্বামীর কোনো নির্দেশ মানতে স্ত্রী মোটেও বাধ্য নয়। কোনো মুমিন স্ত্রী স্বামীর এমন কোনো নির্দেশ পালন করতে পারেনা, যা আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী পর্যায়ে পড়ে। কারণ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"স্রষ্টার নাফরমানী পর্যায়ে পড়ে এমন কোনো বিষয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।"

স্বামী আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী পর্যায়ের কোনো নির্দেশ স্ত্রীকে দিতে পারবেনা। স্বামীর অন্য যে কোনো নির্দেশ পালন স্ত্রীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। অন্য যে কোনো ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে আনুগত্য দাবী করার পূর্ণ অধিকার স্বামীর আছে। এমনকি স্বামীর নির্দেশে স্ত্রীকে নফল নামায এবং নফল রোযাও ত্যাগ করতে হবে।

ঙ. স্বামীর ক্ষমতা

১. শাসন ক্ষমতা

স্ত্রীর মধ্যে ঔদ্ধত্য, অহংকার ও অবাধ্যতা দেখা দিলে তাকে শাসন করার অধিকার স্বামীর আছে। স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত না করে, কিংবা আল্লাহ ও রসূল স্বামীকে যেসব অধিকার প্রদান করেছেন স্ত্রী যদি তার কোনো একটি অধিকার খর্ব করে তাহলে স্বামী প্রথমে তাকে উপদেশ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করবে। এতে স্ত্রী শুধরে না গেলে স্বামী তার আচরণে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করবে। তাতেও না শুধরালে স্বামী তাকে মারধোরও করতে পারবে। কুরআনে মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا - (النساء:٣٤)

"আর যেসব নারীর ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতার আশংকা করবে, তাদের তোমরা

বুঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাকো এবং প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালানোর ছুতা তালাশ করোনা।"

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"ন্যায় সঙ্গত আদেশ অমান্য করলে তোমরা স্ত্রীদের মারো। তবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেনা এবং মুখমণ্ডলে আঘাত করবেনা।"

এখানে আরেকটা কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আর তা হচ্ছে এই যে, স্ত্রী যে পরিমাণ 'অপরাধ' করবে কেবল সে পরিমাণ শাস্তি প্রদানের অধিকারই স্বামীর আছে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে সেটা যুল্‌ম বলে বিবেচিত হবে এবং তাতে স্বামী গুনাহগার হবে। তবে উভয়েরই উচিত আল্লাহকে ভয় করা।

স্ত্রীর উচিত স্বামীর অবাধ্য হবার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা আর স্বামীর উচিত স্ত্রীকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। উভয়ের জন্যে এটাই মঙ্গলকর।

২. তালাক দেয়ার ক্ষমতা

পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা আরেকটি ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তা হলো তালাক দেয়ার ক্ষমতা। স্ত্রীকে তালাক দেয়া ইসলাম স্বামীর জন্যে বৈধ করে দিয়েছে, কিন্তু তালাক হচ্ছে নিষ্ঠুর শাস্তি, একটা চরম দণ্ড এবং চিরতরে সম্পর্ক ছিন্নের পথ। তাই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ ـ (ابوداؤد)

"হালাল কাজ সমূহের মধ্যে আল্লাহর সবচাইতে অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক।" (আবু দাউদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার)

এ বৈধ কাজটিকে অপছন্দনীয় ঘোষণা করার কারণ হলো, এটাকে যেনো খেল তামাশার ব্যাপার মনে না করা হয়। এ হাদীস থেকে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তালাক কেবল সেই অবস্থাতেই বৈধ যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মিল মহব্বতের আর কোনো প্রকার সম্ভাবনাই বাকি থাকেনা। কেবল মজা উড়ানোর জন্যে নতুন নতুন বিয়ে করা আর তালাক দেয়াকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এমনটি করতে পারেনা। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ

"বিয়ে করো। তালাক দিওনা। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বাদ সন্ধানকারী এবং

স্বাদ সন্ধানকারিণীদের মোটেও পছন্দ করেননা।"

মওলানা মওদূদী (রঃ) কুরআন হাদীসের আলোকে তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন ঃ

"কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, স্ত্রীকে পছন্দ না হলেও তার সাথে বসবাস করার যথাসাধ্য চেষ্টা করো ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا۔ (النساء: ١٩)

'আর স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। তারা যদি তোমাদের মনের মতো না হয়, তবে হতে পারে কোনো জিনিস তোমরা পছন্দ করোনা কিন্তু তাতেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিলে মিশে থাকতে না পারলে তালাক দেবার অধিকার তোমার আছে। একইবারে (৩ তালাক দিয়ে) বিদায় করা জায়েয নয়। প্রতি মাসে একটি করে তালাক দেবে। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ তুমি ভেবে চিন্তে দেখার সুযোগ পাবে। হয়তো মিল মিশের কোনো উপায় বেরও হয়ে যেতে পারে। অথবা স্ত্রীর আচরণের মধ্যে তোমার পছন্দনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিংবা তোমার মনোভাবও পালটে যেতে পারে। হাঁ, যদি তৃতীয় তালাকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে ছাড়াছাড়িরই সিদ্ধান্ত নিয়ে থেকো, তবে তৃতীয় মাস সমাপ্তির সাথে সাথেই তালাক দিয়ে দাও কিংবা পুনঃ গ্রহণ ছাড়াই ইদ্দত অতিবাহিত করার সুযোগ দাও ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ۔(البقرة)

"তালাক দুইবারই। এরপর হয়তো ভালোভাবে ফিরিয়ে রাখা কিংবা ভালোভাবে বিদায় দেয়া।" (বাকারাহ রুকু ঃ২৮) [৪]

তালাকের শরীয়তসম্মত সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– স্ত্রীর ঋতু চলাকালীন অবস্থায় তালাক দেয়া যাবেনা। তালাক যদি দিতেই হয়, তবে তা দিতে হবে ঋতু থেকে পবিত্র হবার পর পবিত্র অবস্থায়। এক পবিত্রকালীন সময়ে (তহুর) একটি মাত্র তালাক দেবে। এমনি করে তৃতীয়বার তালাক দেয়ার সময় এলে তালাক না দিয়ে এমনিতেই ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হতে দেয়া উত্তম পন্থা। এ অবস্থায়

---

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ হুকুকুয যাওজাইন।

স্বামী স্ত্রী ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে পুনরায় বিয়ে হবার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তৃতীয় পবিত্রতায়ও তালাক দিয়ে দিলে চূড়ান্ত তালাকে পরিণত হয়ে যায়।[৫]

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো যে ঃ

১. *তালাকের ক্ষমতা স্বামীর আছে।*
২. *তবে স্বামী মিলেমিশে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।*
৩. *শেষ পর্যন্ত মিলে মিশে থাকা সম্ভব না হলে তালাক দেবে।*
৪. *একবারে তালাক দেয়া যাবেনা।*
৫. *এক মাস অন্তর অন্তর ঋতু থেকে পবিত্র হবার পর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেবে।*
৬. *তৃতীয় তালাকের পূর্ব পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকবে।*
৭. *ফিরিয়ে নিতে হলে উত্তমভাবে ফিরিয়ে নিতে হবে।*
৮. *বিদায় দিতে হলেও সদ্ভাবে বিদায় দিতে হবে। অর্থাৎ- তার জন্যে মোহর ও খোরপোষ বাবদ যা ব্যয় করা হয়েছিল তা দাবী করা যাবেনা। মোহর পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করে দিতে হবে।*
৯. *তালাক ইসলামে একটি অপছন্দনীয় কাজ।*

চ. স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর অভিভাবক ও পরিচালক বানিয়ে দেয়। সুতরাং অভিভাবক পরিচালক ও কর্তা হিসাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি তাকে অভিভাবকত্ব প্রদানকারিণীর প্রতি রয়েছে তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১. মোহর

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী তার মোহর পরিশোধ করে দেয়া। এ ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মোহর হচ্ছে বিয়ের অন্যতম শর্ত। মোহর ছাড়া বিয়েই হয়না। মোহরের মাধ্যমেই স্বামীর জন্যে স্ত্রী সহবাস হালাল হয়। মোহর পরিশোধ না করলে কিংবা অন্তত পরিশোধের নিয়্যত না থাকলে স্ত্রী সহবাস দ্বারা কোনো ব্যক্তি কেবল যিনা ব্যভিচারের কাজই করে থাকে। ইসলাম মোহর পরিশোধ করাকে

---

৫. তালাকের বিস্তারিত মাসআলা জানার জন্য ফিকাহ্‌র কিতাব দেখুন।

স্বামীর জন্যে ফরয করে দিয়েছে এবং তা স্ত্রীর সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিশোধ করা স্বামীর কর্তব্য করে দিয়েছে।

২. ভরণ পোষণ

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব। ইসলাম যেসব কারণে স্ত্রীর উপর স্বামীকে মর্যাদাবান করেছে, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ـ (النساء : ٣٤)

"পুরুষ নারী একজনের উপর আরেকজনকে যে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদাবান করেছেন তার ভিত্তিতে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল আর এ কারণেও যে পুরুষ তার জন্যে নিজের অর্থসম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

এখানে মনে রাখতে হবে, মোহর আর খোরপোষ কিন্তু এক জিনিস নয়। স্বামী স্ত্রীর খোরপোষ বা ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালনের দ্বারা মোহর পরিশোধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়না। মোহর ও ভরণ পোষণ উভয়টিই স্বামীর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। উভয় দায়িত্ব পালন করাই স্বামীর জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য। এর একটি দায়িত্ব পালনের দ্বারা আরেকটি দায়িত্ব পালন থেকে স্বামী কখনো মুক্তি পেতে পারেনা।

ভরণ পোষণের ব্যাপারে ইসলামের নীতি হচ্ছে স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ পোষণ যোগাবে। সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা কারো উপর চাপিয়ে দেননা। আবার সামর্থ্য থাকা সত্বেও স্ত্রীর ভরণ পোষণের ব্যাপারে কার্পণ্য করা স্বামীর জন্যে জায়েয নেই। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتَاهَا ـ (الطلاق : ٧)

"যাকে অর্থসম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সে হিসাবেই তার স্ত্রী পরিজনের জন্যে ব্যয় করা, আর যার আয় উপার্জন সীমিত, সে হিসেবেই আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে তার ব্যয় করা উচিত। আল্লাহ প্রত্যেকের উপরই তার সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।" (সূরা তালাক ঃ ৭)

এ ব্যাপারে কুরআন আরো বলেছে ঃ

وَعَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ـ

"স্বামী ধনী ও সচ্ছল হলে সচ্ছলতার ভিত্তিতেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিতে হবে আর দরিদ্র হলে দারিদ্রের ভিত্তিতে।"

৩. সদ্ব্যবহার

স্বামীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। বস্তুত, সদ্ব্যবহার পাওয়া স্বামীর উপর স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকারও বটে। বৈবাহিক সম্পর্কটাই হচ্ছে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক। আর প্রেম প্রীতির অনিবার্য দাবীই হচ্ছে দয়া, সহানুভূতি ও সদাচার। স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসবে। মধুর আচরণে মুগ্ধ করে তুলবে তার হৃদয় মনকে। চমৎকার সান্নিধ্যে স্ত্রীকে করে তুলবে স্বামীগতপ্রাণ। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছে ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

"আর স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, সদভাবে জীবন যাপন করো।" (সূরা নিসা ঃ ১৯)

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ ـ

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে নিজ পরিবারের সঙ্গে স্নেহশীল আচরণ করে।"

৪. স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ

যদি কোনো ঈমানদার ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, যতোই চেষ্টা করুক মানুষ স্ত্রীদের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করতে পারবেনা, স্ত্রীদের সঙ্গে মেপে মেপে তুলাদণ্ডে সমান আচরণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতিই আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং কোনো একজনের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়া যাবেনা যাতে অন্যরা ঝুলে থাকে। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

"কোনো একজন স্ত্রীর দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়োনা যাতে করে অন্যরা ঝুলন্ত হয়ে পড়ে।" (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

এতটুকু ইনসাফও যদি স্ত্রীদের মধ্যে কায়েম করার ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে একজন মাত্র স্ত্রী রাখারও নির্দেশ রয়েছে ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً - (النساء: ٣)

"হাঁ তোমাদের যদি স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করার ব্যাপারে আশঙ্কা হয়, তবে কেবল একজনই মাত্র স্ত্রী রাখবে।" (সূরা নিসা ঃ ৩)

ইমাম ইবনে কোদামা আল মাকদেসী তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'মিনহাজুল ক্বাসেদীন'-এ কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিম্নোক্ত কর্তব্যসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

১. অলীমা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। কারণ এটা মুস্তাহাব।

২. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

৩. স্ত্রীর সাথে হাসি খুশী ও আনন্দদায়ক আচরণ করবে। আনন্দদায়ক খেলাধূলা করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন।

৪. লজ্জাশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

৫. সন্দেহজনক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ এমন কোনো কথা বলবেনা ও এমন কোনো কাজ করবেনা যাতে পারস্পরিক সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

৬. ভরণ পোষণের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

৭. স্ত্রীকে দীনিশিক্ষা প্রদান করবে। যেমন পবিত্রতার বিধান, নামায রোযা ও অন্যান্য যাবতীয় ইবাদতের নিয়ম কানুন।

৮. একাধিক স্ত্রী হলে তাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে।

৯. স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখা দিলে প্রথমে তাকে বুঝাবে ও নসীহত করবে। তাতে ঠিক না হলে বিছানা পৃথক করে দিবে। এভাবে করলেই ভালো হয় যে, তার দিকে পিছু দিয়ে শোবে এবং তিনদিন কথাবার্তা বলবেনা। এতেও যদি সংশোধন না হয় তবে প্রহার করবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবেনা, শরীরে ক্ষত করবেনা।

১০. উত্তম পন্থায় সহবাস করবে। বিসমিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করবে ঃ কেবলামুখী হয়ে সহবাস করবেনা। হায়েয নেফাস অবস্থায় সহবাস করবেনা।

ছ. স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সেগুলোই স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার। এই বিষয়গুলো স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য শিরোনামে আলোচনা করে এসেছি। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে স্বামীর উপর স্ত্রীর নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ রয়েছে ঃ

১. সন্তুষ্টি সহকারে মোহর লাভের অধিকার।

২. ভরণ পোষণ লাভের অধিকার। ভরণ পোষণ স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে।

৩. সদ্ব্যবহার লাভের অধিকার।

৪. ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ লাভের অধিকার।

৫. স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

৬. স্বামীর উপর স্ত্রীর আরেকটি অধিকার হচ্ছে এই যে, স্বামী সর্বপ্রকার যৌন উশৃংখলা থেকে বিরত থাকবে এবং যৌন ব্যাপারে কেবল স্ত্রীর উপরই সন্তুষ্ট থাকবে।

জ. স্ত্রীর ক্ষমতা

ইসলাম যেমন পুরুষকে অপছন্দনীয় বা যার সাথে কোনো প্রকারেই বসবাস করা সম্ভব নয়, সে রকম স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা দিয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যদি তার স্বামীকে পছন্দ না করে বা কোনো মতেই তার সাথে ঘর করা সম্ভব নয় বলে মনে করে, তবে সে তার থেকে খোলআ করিয়ে নিতে পারে। আর তালাকের মতো কেবল অনন্যোপায় অবস্থায়ই সে এ পথে অগ্রসর হতে পারবে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে নারী স্বামীর কোনোরূপ ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই খোলআর আশ্রয় নেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও মানব জাতির অভিশাপ বর্ষিত হয়।"[৬]

ঝ. স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি যেমন স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি স্বামীর প্রতিও রয়েছে স্ত্রীর বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর যেহেতু স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান করেছেন, স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ

---

৬. খোলআ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে ফিকাহ্‌র কিতাব দেখুন।

করেছেন, সর্বোপরি স্ত্রীর উপর তাকে কর্তৃত্বশালী করেছেন সে জন্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনেক বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা স্বাভাবিক। স্ত্রীর নিকট আল্লাহ ও রসূলের পরেই স্বামীর মর্যাদা। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, কোনো মানুষকে যদি সিজদা করার অনুমতি থাকতো, তবে আমি স্বামীদেরকে সিজদা করার জন্যে নারীদেরকে নির্দেশ দিতাম। আল্লাহ তা'আলা সালেহ নারীদের গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ.(النساء:٣٤)

"সালেহ নারীরা (স্বামীদের প্রতি) বিনয়াবনত হয়ে থাকে এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর পর্যবেক্ষণের অধীন তাদের অধিকার রক্ষণ করে থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

অর্থাৎ স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি বিনয়ই হবে সালেহ নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। একজন সালেহ নারী কখনো স্বামীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারেনা। পারেনা স্বামীর প্রতি অবাধ্য হতে। আনুগত্য এবং বিনয়ই হলো তার ভূষণ।

তার দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার অধিকার রক্ষা করা। এর দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতেও সে তার নিজেকে সর্বপ্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে হিফাযত করবে। তার দেহ মন তার নিকট স্বামীর আমানত। সুতরাং তার দেহমনের চৌহদ্দিতে ভিন্ন পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কখনো এ আমানতের খিয়ানত করবেনা। কোনো ঈমানদার খোদাভীরু নারী এটি কল্পনাও করতে পারেনা। এর দ্বিতীয় দিকটি হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে স্বামীর অর্থসম্পদের সংরক্ষক, আমানতদার। এতে স্বামীর ইচ্ছার বিপরীত কোনো প্রকার খেয়ানত করবেনা।

স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর আরেকটি কর্তব্য কাজ। স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে তার খেদমত করা জরুরী। অবশ্য স্বামীর খেদমত করাকে ইসলাম স্ত্রীর জন্যে ফরয করে দেয়নি এবং খেদমত দাবী করার অধিকারও স্বামীর নেই। কিন্তু উভয়ের সাথে উভয়ের যে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা গড়ে দিয়েছেন এবং স্ত্রীর যাবতীয় দায় দায়িত্ব যেভাবে পুরুষের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর উপর স্বামীর খেদমত করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

"স্বামীদের উপর স্ত্রীদের সেসব অধিকার রয়েছে যেসব অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের।" (আল বাকারা ঃ ২২৮)

এ আয়াত একথাই প্রমাণ করে, যেহেতু স্বামী চরম পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে স্ত্রীর ভরণ পোষণ নির্বাহ করে, সেজন্যে স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর জন্যে কষ্ট করা।

এর বাস্তব প্রমাণ হলো মহিলা সাহাবীগণ। তাঁরা পরম আনন্দে ও চরম ধৈর্য সহকারে স্বামীদের যাবতীয় খেদমত আনজাম দিতেন এবং নিজ হাতে ঘরের যাবতীয় কাজ করতেন। হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ كُنْتُ اَخْدِمُ الزُّبَيْرَ ـ

"আমি আমার স্বামী যোবায়েরের যাবতীয় খেদমত করতাম।"

হযরত ফাতিমা নিজ হাতে যাঁতা চালিয়ে গম পিষতেন। এ কাজে তাঁর খুবই কষ্ট হতো। এমনকি তিনি পিতার নিকট পরিচারিকার আবেদন করেও ব্যর্থ হন। মূলত, ইসলাম স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা ও দায়ত্বশীলা বানিয়েছে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا ـ

স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল পরিচালক। (বুখারী)

সুতরাং স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর যাবতীয় খেদমত করা এবং ঘরের কাজ নিজ হাতে যথাসম্ভব করা। আর এতেই তার জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্যায়ে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ اَنْ تَاْذَنَ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَ لَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تُطِيْعُ لِيْهِ اَحَدًا وَلَا تَغْتَزِلُ فِرَاشَهُ فَاِنْ كَانَ هُوَ اَظْلَمُ فَلْتَاْتِهِ حَتّٰى تُرْضِيَهِ فَاِنْ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَ تَغْتَسِلُ وَقَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهَا وَ اَفْلَحَ حُجَّتَهَا وَاِنْ هُوَ لَمْ يُرْضِ فَقَدْ اَبْلَغَتْ عِنْدَ اللّٰهِ عُذْرَهَا ـ

"আল্লাহর প্রতি ঈমানদার নারীর পক্ষে তার স্বামীর ঘরে এমন ব্যক্তিকে আসবার অনুমতি দেয়া বৈধ নয়; যাকে তার স্বামী পছন্দ করেনা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া তার জন্যে বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কারো কথা মানাও তার উচিত নয়। স্বামীর শয্যা থেকে দূরে থাকা তার জন্যে বৈধ নয়।

স্বামী অত্যাচারী হলে সাধ্যমত তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এ খেদমত স্বামী গ্রহণ করলে তো ভালোই। আল্লাহ তার ওযর কবুল করে নেবেন। আর তার সত্যপন্থী হওয়াটা প্রকাশ করে দেবেন। আর এতে যদি স্বামী সন্তুষ্ট না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার অক্ষমতার ওযর পৌঁছে যাবে।" (মুসতাদরাকে হাকেম)।

স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে সদা তৎপর থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। মুসলিম শরীফে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না। তাদের কোনো নেক কাজ আকাশে উত্থিত হয়না। তারা হচ্ছে ১. পলাতক ক্রীতদাস, যতোক্ষণ না সে মনিবের নিকট ফিরে আসবে। ২. নেশাখোর মাতাল, যতোক্ষণ না সে প্রকৃতিস্থ হবে এবং ৩. সেই নারী যার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট, যতোক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।"

স্ত্রীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর যৌন দাবী পূরণ করা। একমাত্র শরয়ী ওযর ছাড়া স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা স্ত্রীর জন্য অবৈধ। বরঞ্চ সহাস্য বদনে আনন্দ চিত্তে স্বামীর দাবী পূরণ করা স্ত্রীর কর্তব্য। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী যখন স্ত্রীকে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে) শয্যায় আহবান করে তখন সে যদি স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।" (বুখারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ حَلَّتْ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ -

"স্বামী যখন যৌন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকবে, তখন সে চুলায় রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া উচিত।" এমনকি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে স্বামীর অনুমতি ব্যতিত নফল রোযা রাখতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন ঃ

لَاتَصُوْمُ اِمْرَاَةٌ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا -

"কোনো স্ত্রী যেনো তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিত (নফল) রোযা না রাখে।" (আবুদাউদ, বুখারী)

ঞ. সফল সুখময় দাম্পত্য জীবন

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا

إِلَيْهَا ـ (الروم : ٢١)

"আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন, যেনো তোমরা তার নিকট পরম শান্তি, চরম তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারো।" (সূরা রূম ঃ ২১)

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকেই মানুষের জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। তাদের পরস্পরের প্রতি চরম আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুতার বীজ বপণ করে দিয়েছেন। তাদের অন্তরে একত্রবাস ও মিলনাকাঙ্খা স্থায়ী করে দিয়েছেন। একের প্রতি অপরের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন দয়া, অনুগ্রহ, প্রীতি আর সহানুভূতি।

আমাদের মহান রব আল্লাহ রাহমানুর রাহীম মানব মনে এসব চাহিদা ঢেলে দেবার সাথে সাথে তা পূরণের জন্যেও দিয়েছেন কল্যাণময় বিধি বিধান। তিনি মানুষকে পশুর মতো করে সৃষ্টি করেননি। মানুষের চাহিদা নিবৃত্তির জন্যে পশুর মতো ব্যবস্থাও তিনি দেননি। তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তার চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তার জীবন যাপনের পন্থা বাতলে দিয়েছেন। তার জৈবিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণের নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন। তিনি মানুষের হাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার চাবিকাঠি দিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাহমানের বিধি বিধান মেনে চলার মাধ্যমেই কেবল মানব জীবনে সুখশান্তি আসতে পারে। উশৃঙ্খলতা কিংবা স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে তার কোনো কল্যাণ নেই। পাশবিক জীবন যাপনেও থাকেনা কোনো মর্যাদা ও সফলতা।

তাই মানব জীবনের উপরোল্লেখিত অনিবার্য চাহিদাসমূহ পূরণ করার জন্যে মহান আল্লাহ তা'আলা যে বৈবাহিক বিধান দান করেছেন, তাই হচ্ছে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। আর এ বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় তার সুখ ও সফলতা নির্ভর করে কেবলমাত্র খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক ও শরয়ী বিধি ব্যবস্থা অনুসরণ ও অনুবর্তনেরই উপর। এ অনুসরণ ও অনুবর্তনের ক্ষেত্রে কেউ যদি আন্তরিক হতে না পারে তবে তার দাম্পত্য জীবনের সুখ সফলতাও সুদূর পরাহত। একথা দিবালোকের মতো সত্য, যে মহান খোদা নারী ও পুরুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, দাম্পত্য জীবনে সে মহান আল্লাহর আইন ও ইচ্ছার অনুসরণ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সুখ ও সফলতা আসতে পারেনা। আসা সম্ভবই নয়।

এ অধ্যায়ে কুরআন হাদীসের আলোকে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আমরা খোদায়ী বিধানের ব্যাপক আলোচনা করেছি। এসব বিধি বিধানের অনুসরণ অনুবর্তন প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্যে অপরিহার্য। এখানে আমরা আরো এমন কতিপয় বিষয় আলোচনা করতে চাই, সফল সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্যে যেগুলো একান্তই অপরিহার্য।

১. পরস্পরকে সঠিক উপলব্ধি করা

দাম্পত্য জীবনে এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়ের পর স্ত্রীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর মেজাজ এবং স্বভাব প্রকৃতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। একজন নারী সারাটি জীবনের জন্যে যাকে আপন করে নিয়েছে, যার সাথে সারাটি জীবন একত্রে কাটাতে হবে, যার সুখ হবে তার সুখ, যার দুঃখ হবে তার দুঃখ, যার সন্তোষ বিধান এবং মনোবাসনা পূরণ তার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব, সে ব্যক্তিটিকে সঠিকভাবে জানা এবং তার রুচি, তার মেজাজ তার স্বভাব প্রকৃতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা তার জন্যে অপরিহার্য। কারণ স্বামীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে, তার রুচি ও স্বভাব প্রকৃতি বুঝতে না পারলে তাকে সন্তুষ্ট করা, তার মনের মতো করে নিজেকে গড়ে তোলা এবং নিজের কর্মতৎপরতায় তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো কোনো নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যদি কোনো নারী ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তবে তাদের দাম্পত্য জীবনে ঘুণে ধরা অসম্ভব কিছু নয়।

স্বামীকে উপলব্ধি করার জন্যে স্ত্রীকে সদা সচেতন থাকতে হবে। এ সচেতনতা সবসময় অব্যাহত রাখতে হবে। স্বামীর রুচি ও মেজাজ প্রকৃতি সম্পর্কে স্ত্রী যখন যতোটুকু উপলব্ধি করবে, তখনই নিজের রুচি ও মেজাজকে পরিবর্তন করে স্বামীর রুচি ও মেজাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর এ কাজ অব্যাহতভাবে করে যেতে হবে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে হবে যে, স্বামীর ইচ্ছাই হবে তার ইচ্ছা, স্বামীর রুচিই হবে তার রুচি।

স্বামীর স্বভাব ও রুচিতে যদি এমন কিছু থাকে, যা তার অপছন্দনীয়, তবে সরাসরি তার প্রতিবাদ করা ঠিক নয়। হাঁ, স্বামীর মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা ইসলামের দৃষ্টিতে অসমর্থনীয় ও অপছন্দীয়, তবে স্ত্রীকে অতিশয় হিকমত ও কৌশলের সাথে তা সংশোধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর উভয়ের মধ্যে যদি প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক হয় অতি নিবিড় মধুময়, তবে একজন দীনদার মহিলার পক্ষে তার স্বামীকে সংশোধন করা মোটেও কঠিন নয়।

এমনকি স্বামীর কুরুচি এবং কুস্বভাবের সংশোধন করাও তখন স্ত্রীর জন্যে কোনো কঠিন কাজ হয়না।

স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট মুক্ত ও খোলা হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। স্বামী ও তার মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার আড়াল থাকবেনা। স্বামীর নিকট তাকে হতে হবে আয়নার মতোন। স্বামী যেনো তার আন্তরিকতা, সততা, নেক নিয়্যত ও নিষ্কলুষ জীবনকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীর চিন্তা, কথা ও কাজ দ্বারা এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারবেনা যার দ্বারা স্বামীর অন্তরে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে।

ঠিক স্বামীর উপরও এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে যে, তিনি স্ত্রীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করবেন। পুরুষকে উপলব্ধি করার চাইতে নারীকে উপলব্ধি করাটা কিছুটা কঠিন বটে। কারণ পুরুষের আবেগ যতোটা প্রকাশিত হয় নারীর ততোটা হয়না। নারী প্রকৃতিগতভাবেই একটু চাপা স্বভাবের হয়ে থাকে। কিন্তু পুরুষ বুদ্ধিমান ও সচেতন হলে সহজেই স্ত্রীর স্বভাব রুচি ধরা পড়বে তার কাছে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর স্বভাব চরিত্রে কোনো কিছু ধরা পড়লে স্বামীর উচিত তাকে নসীহত করা। স্বামী আন্তরিকভাবে নসীহত করলে স্ত্রী সংশোধন হয়ে যেতে পারে।

মোটকথা, স্বামী স্ত্রী উভয়েই একে অপরকে ভালোভাবে জানতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে একে অপরের হৃদয় মনকে। একজনকে আরেকজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্ত্রীর দায়িত্ব একটু বেশী। আর এ ব্যাপারে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে সেকরিফাইস। অর্থাৎ– একে অপরের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে পরস্পরের মেজাজ ও ইচ্ছা অভিরুচির কতোটা গ্রহণ বর্জন করতে পারলেন সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মনে রাখবেন, এ বিষয়টির সফলতা দাম্পত্য জীবনের সফলতার ভিত্তি। আর এ বিষয়টির ব্যর্থতা দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার সূত্র।

২. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা

দাম্পত্য জীবনের সফলতার আরেকটি শর্ত হচ্ছে, একে অপরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা। স্বামী স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নেবে। স্ত্রীও স্বামীকে বরণ করে নেবে তার হৃদয় ভরে।

মানুষ হিসেবে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে। অথবা স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যা স্বামীর পছন্দনীয় নয় এবং স্বামীর

মধ্যেও এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যা স্ত্রীর পছন্দনীয় নয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন। এরকম দুর্বলতা সাধারণত নারীদের মধ্যেই একটু বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার সাথে সাথে তাদের মধ্যে কিছু গুণ যে পাওয়া যায়না তা নয়। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা (over look) করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ একমাত্র এ নীতির মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا - (النساء: ١٩)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সুন্দর চমৎকার আচরণ করো। ভালোভাবে বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে কিছু ভালাই এবং অগাধ কল্যাণ নিহিত রেখে থাকবেন।"

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ - (مسلم)

"কোনো মুমিন পুরুষ যেনো কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার মধ্যে একটি বিষয় অপছন্দনীয় থাকলেও অপরাপর গুণাবলী অবশ্যই পছন্দনীয় পাওয়া যাবে।" (মুসলিম)

অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর খুঁটিনাটি দুর্বলতা উপেক্ষা করা উচিত এবং তার অন্যান্য গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এভাবে দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী উভয়ই একে অপরের সামান্য দোষত্রুটি উপেক্ষা করে সৎ গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। একজনের অন্তরে আরেকজনের জন্যে কোনো প্রকার ঘৃণা, জিদ ও উপেক্ষা থাকা কোনো অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাতে দাম্পত্য জীবন দুঃখ ও বিষাদে ভরে উঠে।

দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করার জন্যে উভয়েরই দায়িত্ব হচ্ছে একে অপরকে একান্ত আপন করে নেয়া। তাদের সম্পর্ক হবে একান্ত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ। একের অন্তরে অপরের প্রতি কোনো প্রকার বিতৃষ্ণা থাকবেনা। থাকবে কেবল ভালোবাসার আবেগ আর হৃদয়ের টান।

৩. পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এটাও একটি জরুরী শর্ত। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর যে দাম্পত্য জীবন এবং যে ছোট্ট সংসার গড়ে উঠে, তাতে তাদের দু'জনের মধ্যে

সমঝোতা অপরিহার্য। দুটি ভিন্ন পরিবেশের দু'জন লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে জীবন যাপন শুরু করে। দুটি ভিন্ন পরিবেশে তারা গড়ে উঠেছে, লালিত পালিত হয়েছে এবং শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে। সুতরাং উভয়ের মেজাজ প্রকৃতি ও আচরণে কিছুটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ দু'জন লোককে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়নি। তাছাড়া পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত ভিন্নতা একটি সত্য ও বাস্তব জিনিস। সুতরাং একজনের জন্যে আরেকজনের কিছুটা ত্যাগ ও সেকরিফাইস করা উচিত। একজনের রুচি প্রকৃতি ও আচার আচরণ আরেকজনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তারটা মেনে নেয়ার মতো মানসিকতা রাখতে হবে। একজনের চিন্তা আরেকজনের চিন্তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। এভাবে কিছুটা 'লেনদেন' নীতির ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী নিঃস্বার্থ সমঝোতা গড়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে স্ত্রীকে অধিক ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ স্বামীর সঙ্গে মিলে মেশে সমঝোতা করে থাকার ব্যাপারে স্ত্রীর দায়িত্বই অধিক। তবে স্বামীরও অনেক কর্তব্য রয়েছে। মোটকথা, উভয়ই এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা উচিত।

কিন্তু সমঝোতার জন্যে প্রয়োজন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। স্বামী স্ত্রী উভয়কেই পরস্পরের ব্যাপারে পরম ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়া উচিত। একে অপরের রুচি ও প্রকৃতির ব্যাপারে সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। আচার আচরণ ও চাল চলনের ব্যাপারে সহনশীল হওয়া উচিত। কথাবার্তার ধরন এবং জ্ঞান বুদ্ধির দুর্বলতার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য এবং যৌন ব্যাপারে সংযত ও ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। মোটকথা, এমন প্রতিটি ব্যাপারেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন যেসব ব্যাপারে অসুবিধা, বিরক্তি, মনোকষ্ট, রাগ এবং অন্যান্য সঙ্কট সৃষ্টি হবার আশঙ্কা থাকে।

৪. গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের ইযযত রক্ষক ও দুর্গ। তারা একজন আরেকজনের ইয্যত নষ্ট করতে পারেনা এবং অপর লোকদের নিকট দাম্পত্য জীবনের কোনো গোপনীয়তা প্রকাশ করতে পারেনা। তাদের একজনের গোপন বিষয় আরেকজনের নিকট আমানত স্বরূপ। এ আমানতের খেয়ানত করা সাংঘাতিক গুনাহ্র ব্যাপার। স্বামী স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করা একটি চরম অশ্লীলতা ও শয়তানী কাজও বটে।

মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাযের সালাম ফিরিয়ে আমাদের বসে থাকতে নির্দেশ

দিয়ে বললেন ঃ শোনো, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে নিজের স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দেয় এবং পর্দা ফেলে দেয়? পরে যখন লোকদের কাছে আসে তখন বলতে থাকে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এই এই করেছি? আবু হুরাইরা বললেন ঃ প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ থাকলেন। পরে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা নামাযীদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে এ ধরনের কথাবার্তা বলে?

এক যুবতী হাঁটুর উপর ভর করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে চেষ্টা করছিল। সে বললো ঃ 'আল্লাহর কসম! পুরুষরাও এরকম কথাবার্তা বলে এবং নারীরাও।'

তার বক্তব্য শুনে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন ঃ

هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ ؟ اِنَّ مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ وَ شَيْطَانَةٍ لَقِىَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَلٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ ـ (احمد. ابوداؤد)

"যে ব্যক্তি এমনটি করে তার দৃষ্টান্ত তোমরা জান কি? তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে শয়তান পুরুষ ও শয়তান নারীর মতোন, যে তার সঙ্গীর সাথে রাজপথে মিলিত হয়ে স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করে আর সমস্ত মানুষ তা অবলোকন করে।" বস্তুত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে অকৃত্রিম প্রণয় ভালোবাসা বিনিময় হতে থাকে তা উভয়ের একান্ত গোপন বিষয়। তারা যদি পরস্পরের গোপন বিষয় অন্য লোকদের নিকট বলে দেয় তবে তা হয় এক জঘন্য খেয়ানত ও নির্লজ্জ ব্যাপার। খেয়ানতের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই ঈমানদার নারী ও পুরুষদের এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

৫. যৌন দাবী পূরণ

বৈবাহিক সম্পর্কের সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য হলো যৌন চাহিদা পূরণ। মানুষকে যিনা ব্যভিচার থেকে রক্ষা করার জন্যেই ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। তাই বৈবাহিক জীবনে একে অপরের যৌন দাবী পূরণ করা স্বামী স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব। উভয়েরই যৌন চাহিদা রয়েছে। তবে চাহিদা পূরণের দাবী স্বামীর পক্ষ থেকেই অধিক উত্থাপিত হয়ে থাকে। স্বামীর এ দাবী পূরণ করা স্ত্রীর জন্যে অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। তিনি নারীদেরকে স্বামীর যৌন

আহবানে সাড়া দেয়া থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, যে নারী স্বামীর যৌন আহবানে সাড়া দেয়া থেকে বিরত থাকে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং ফেরেশতারা তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। এমনকি স্ত্রী চুলার উপর রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ তার প্রতি রয়েছে।

অবশ্য স্ত্রীর ওযর অসুবিধা দেখাও স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রীর বাস্তব কোনো ওযর থাকলে এবং হায়েয নেফাস অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা স্বামীর কর্তব্য। কিন্তু কোনো কৃত্রিম ওযর পেশ করা স্ত্রীর জন্যে জায়েয নয়।

অন্য দিকে স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করাও স্বামীর কর্তব্য। যদিও স্ত্রীরা এ ব্যাপারে একটু চাপা স্বভাবের হয়ে থাকে, তবুও স্বামীকে তার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দূর দেশে যুদ্ধরত সৈনিকদেরকেও চার মাসে একবার এসে স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মোটকথা, যৌন চাহিদা একটু নাজুক ব্যাপার। এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর উভয়কেই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আর বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য তো এটিই। এ দাবী পূরণে কোনো একজনের পক্ষ থেকে অবহেলা দেখা দিলে দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। একজনের প্রতি আরেকজন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে। এভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে পারে। এবং সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠা এভাবে সম্ভব নয়।

৬. হাস্য রসিকতা

সুন্দর চমৎকার দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্কের জন্যে হাস্য রসিকতা একটা চমৎকার মাধ্যম। হাস্যরসিকতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুনিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়। এতে একে অপরের ছোট খাটো ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভুলে যেতে পারে। এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে প্রাণভরা ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং একজনের প্রতি আরেকজন পরম আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর স্ত্রীদের সাথে হাস্য রসিকতা করতেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلِيْ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِيْ قَالَ هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ ـ

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে আমি জিতে যাই। কিন্তু যখন আমার শরীর ভারী হয়ে পড়ে তখন আবার দৌড় প্রতিযোগিতা করলে আমাকে হারিয়ে তিনি জিতে যান। এ সময় তিনি (রসিকতা করে) বলেন ঃ এটা তোমার সে জিতের প্রতিশোধ।" (আবু দাউদ)

এখানে স্ত্রীদের একটি কথা মনে রাখা দরকার। তা হলো, স্বামীদের উপর সাধারণত বাইরের অনেক দায় দায়িত্ব অর্পিত থাকে। আয় উপার্জনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে। আর এসব দায়িত্ব পালন কখনো নির্ঝঞ্ঝাট হয়না। এসব দায়িত্ব পালনে পুরুষকে প্রতিনিয়ত এক বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে কখনো থাকে চিন্তাযুক্ত, কখনো দুঃখিত, কখনো শোকার্ত, কখনো হতাশাগ্রস্ত, কখনো ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত। তাই, আনন্দ ও হাস্য রসের পরিবেশ সৃষ্টিতে স্ত্রীর দায়িত্ব অধিক হয়ে থাকে। স্বামী যখনই ঘরে আসবে, তার কাছে আসবে, তার সান্নিধ্যে যাবে এবং কাছে অবস্থান করবে। তখন আনন্দে স্বামীর মন ভরে দেবে। স্বামীর হৃদয় মন ও মেজাজকে হালকা করে তুলবে। এ কথাটি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম নারীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার বলেছেন ঃ

وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ـ

"(উত্তম স্ত্রী হচ্ছে সে) যার প্রতি তাকাতেই স্বামীর হৃদয় মন আনন্দে ভরে উঠে।" অর্থাৎ সে প্রেম আর প্রণয়ভরা হৃদয়ে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানায়, সহাস্য বদনে স্বামীর প্রতি তাকায় এবং আনন্দ আবেগে স্বামীর হৃদয় ভরে দেয়।

স্বামীও স্ত্রীকে যথাসাধ্য খুশী করার চেষ্টা করা উচিত। এজন্যে মাঝেমধ্যে উপহার উপঢৌকন দেয়া উচিত। তার মন মেজাজকে উৎফুল্ল রাখা উচিত।

মোটকথা, হাসি আনন্দ রসিকতা সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবনের এক মহামূল্যবান অর্ঘ।

৭. উপহার বিনিময়

উপহার একটি সুন্দর জিনিস। দেখতে চমৎকার। দিলে মনে খুশীর গোলাপ জেগে থাকে। পেলে হৃদয় ভেসে যায় আনন্দ-জোয়ারে। উপহারের আবার কাজ করার ক্ষমতা আছে। তা দারুণ কার্যকর জিনিস। বিষের যেমন ক্রিয়া আছে, মধুর যেমন মাধুর্য আছে, তেমনি উপহারের আছে আপন করার ক্ষমতা, উপহার দুটি প্রাণকে এক করে দেয়, আপন করে দেয়। উপহার একজনের অন্তরে

আরেকজনের জন্যে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ ـ (موطا مالك)

"তোমরা পরস্পরকে হাদীয়া দাও। এতে তোমাদের মধ্যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। হৃদয়ের দূরত্ব কমে যাবে। শত্রুতা বিলীন হয়ে যাবে।" (মুয়াত্তায়ে মালিক)

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার সঙ্গী সাথীদের উপহার দিতেন। তাঁরাও হাবীবে খোদাকে হাদীয়া পাঠাতেন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের হাদীয়া দিতেন। মূলত এ হাদীয়া বা উপহার দাম্পত্য জীবনের জন্যে একটি বিরাট উপকারী জিনিস। এতে উভয়ের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে পৌঁছে। এতে মনের রাগ দূর হয়ে যায়।

উপহার হতে হবে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী। স্বামী যখন বাইরে থেকে ঘরে আসেন, তখন স্ত্রীর জন্যে বিশেষভাবে কিছু খাবার জিনিস হলেও এনে তার হাতে দিলে তার হৃদয় খুশীতে ভরে উঠে। সামর্থ্য অনুযায়ী বিশেষ ধরনের শাড়ী বা অলঙ্কার স্ত্রীকে উপহার দেয়া যায়। ঈদ বা অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে হাদীয়া খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। স্বামী বিদেশ বা দূরের সফর থেকে এলে স্ত্রীর জন্যে কিছু নিয়ে আসা উচিত।

স্ত্রীর হাতে টাকা পয়সা থাকলে তারও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীকে উপহার দেয়া উচিত। এতে করে তার প্রতি স্বামী খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

৮. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কৃতজ্ঞতা এমন একটি জিনিস যা একজনের প্রতি আরেকজনকে অনুরক্ত করে তোলে। কৃতজ্ঞতা বা শোকরগোযারী একজনের প্রতি আরেকজনের প্রেম ও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি। এটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় এবং লজ্জার কাজও নয়। আপনার স্বামী আপনার কোনো একটি কাজে সহযোগিতা করেছে, এতে আপনি তাকে বললেন ঃ 'শোকরিয়া' বা 'তোমাকে ধন্যবাদ'। এতে আপনার কোন ক্ষতি হলনা। বরং আপনি তার এ খেদমতে কৃতজ্ঞ এটাই প্রকাশ পেলো। আর আপনার আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতার এ অভিব্যক্তিতে আপনার স্বামীও আপনার প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে পড়বেন। এভাবে তিনি আপনার জন্যে একটি সুন্দর শাড়ী ক্রয় করলে, আপনার মনোপূত কোনো জিনিস আপনার জন্যে নিয়ে এলে, আপনার জন্যে কোনো প্রকার কষ্ট করলে, আপনার কোনো কাজে সহযোগিতা করলে আপনি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার আন্তরিকতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করুন। এটা আপনার পক্ষে যাদুর মতো ক্রিয়া করবে। দেখবেন আপনার স্বামীও আপনার খেদমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। মনে রাখবেন, স্বামীর একটি সুন্দর কথার জন্যেও তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ভুলবেননা।

অনুরূপভাবে স্বামীরও উচিত স্ত্রীর খেদমতের স্বীকৃতি দেয়া। সে আপনার ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খল করে রাখে, আপনার জন্যে সুন্দর সুস্বাদু খানা তৈরী করে, আপনার জামা কাপড় পরিষ্কার করে দেয়, আপনার অন্যান্য খেদমত করে, আপনার সন্তান লালন পালন করে, আপনার প্রয়োজন ও সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখে, আপনি বাইরে যেতে চাইলে আপনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এগিয়ে দেয়, আপনার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় ইথারের পাথারে হৃদয় পাঠিয়ে দিয়ে আপনার পথপানে চেয়ে থাকে।– এরকম প্রতিটি কাজেই আপনি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার খেদমত ও আন্তরিকতার স্বীকৃতি দিন। আপনার জন্যে এটা খুবই উপকারী হবে।

৯. পারস্পরিক পরামর্শ

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক পরামর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরামর্শ ভিত্তিক কাজ সুন্দর হয়। এর ফল হয় ভালো। এতে কারো বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ থাকেনা এবং অভিযোগ সৃষ্টিও হয়না। সংসারের যে কোনো কাজ করবেন উভয়ে পরামর্শ করে করুন। ব্যক্তিগত ব্যাপারেও পারস্পরিক পরামর্শ নেয়া উচিত। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে খোদায়ী নির্দেশ কার্যকর করার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এতে বুঝা গেলো দীনি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারেও স্ত্রীর পরামর্শ নেয়া যায়। আর স্ত্রীকে তো স্বামীর সাথে পরামর্শ করেই সব কাজ করা উচিত।

মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও অনুগত্য করা। তাঁরই সন্তুষ্টি ও মর্জি অনুযায়ী চলা। তাঁর ক্রোধ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে পূর্ণ গোলামীর জীবন যাপন করা। আর কোনো মানুষের মুসলমান হবার অর্থই হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও গোলামীর জীবনকে কবুল করে নিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনে আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক চলা এবং তাঁর অনুগত হয়ে থাকাই তার সিদ্ধান্ত। আর আল্লাহ তা'আলার মর্জি অনুযায়ী তাঁরই বাধ্যগত ও অনুগত হয়ে জীবন যাপন করার জন্যে প্রয়োজন একই পথের অনুসারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা। একে অপরের কল্যাণকামী হওয়া। একজনের কাঁধের সাথে আরেক জনের কাঁধ মিলিয়ে চলা এখানে খুবই প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজন দীনের পথে একে অপরকে সহযোগিতা করার। প্রয়োজন আল্লাহর পথে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার। প্রয়োজন শয়তানের চেলা চামুণ্ডাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

দুনিয়ার জীবনে স্বামী স্ত্রী এমন এক মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ, যে বন্ধন দুটি জীবনকে একাকার করে দেয়। তাদেরকে একমন, একধ্যান করে দেয়। তাই মুসলমান হিসাবে একই বন্ধনযুক্ত দুটি জীবন দীনের পথে পরস্পরের সহযোগী ও সহমর্মী না হলে তাদের দীনি জীবন দুঃসহ ও বিব্রতকর হয়ে পড়তে পারে। একজন দীনের পথে আরেকজন বিপদগামী হলে এটা দীনদার স্বামী বা স্ত্রীর জন্যে খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার। ইসলামের দাবী অনুযায়ী তাদের উভয়কেই দীনের পথে পরস্পরের সহযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুসলমান দম্পতি একজন আরেকজনকে আল্লাহর পথে হাতে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ পথে এগিয়ে যাবে তারা একজন আরেকজনের প্রতিযোগী হয়ে। সহযোগী ও সহগামী হয়ে। দীনের শিক্ষা, ইসলামের অনুসরণ এবং ইবাদত আন্দোলনে তারা হবে একজন আরেকজনের সহযোগী ও সহমর্মী। তবেই তাদের দাম্পত্য জীবন হবে একমুখী এক প্রাণের। মহান স্রষ্টা হবেন তাদের উপর সন্তুষ্ট। নাযিল করবেন তাদের প্রতি রহমত ও করুণার ফল্গুধারা। তাদের জীবন হবে শান্তি ও বরকতময়।

ক. শিক্ষাগত সহযোগিতা

দীনের পথে চলতে হলে প্রয়োজন দীনের শিক্ষা, দীনের যথার্থ জ্ঞান।

ইসলামের যথার্থ জ্ঞান ছাড়া কেউই দীনের পথে সঠিকভাবে চলতে পারেনা। তাই নারী পুরুষ সকলের জন্যেই ইসলামের জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ দীনের জ্ঞানার্জন করা মুসলমান পুরুষ নারী সকলের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত, দাম্পত্য জীবনে সঠিকভাবে ইসলামী যিন্দেগী যাপনের জন্যে কতিপয় বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। সেগুলো হচ্ছেঃ

ক. ঈমান আকীদাগত জ্ঞান,
খ. ইসলামী আদর্শের জ্ঞান,
গ. ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান,
ঘ. ইসলামের দাম্পত্য বিধানের জ্ঞান।

মনে রাখা দরকার, মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের যে পথনির্দেশ রয়েছে, সেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। এখানে দাম্পত্য জীবনে সঠিকভাবে ইসলামের পাবন্দ হওয়ার জন্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান অপরিহার্য বলে আমরা উল্লেখ করেছি।

স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীকে এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করা। এসব বিষয়ে তিনি নিজে স্ত্রীকে শিক্ষা দিবেন। স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী বই পুস্তক পড়াবেন। যেসব মহিলা দীনের পথে কাজ করছেন তাদের সাথে মেলামেশার সুযোগ দেবেন। তাছাড়া তিনি নিজে যথাযথভাবে ইসলামের বিধান অনুসরণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা প্রদান করবেন। আর এটাই হচ্ছে শিক্ষাদানের অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি। মনে রাখা দরকার, ইসলামী জ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে আকীদাগত বিভ্রান্তি দূর করা। সুতরাং স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো প্রকার আকীদাগত বিভ্রান্তি থাকে তবে প্রথমেই তা দূর করতে হবে এবং সেস্থলে সঠিক ঈমান আকীদার পরিচয় তুলে ধরতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কিত সুপরিচ্ছন্ন জ্ঞান তাকে দান করতে হবে। শিরকী ও জাহেলী আকীদাহ বিশ্বাস থেকে তার চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে দিতে হবে। জাহেলী রসম রেওয়াজ পালনের অভ্যাস দূর করে দিতে হবে। এভাবে বিশ্বাস ও চিন্তাগত দিক থেকে তাকে প্রথমে খাঁটি ঈমানদার বানানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপরই হলো ইসলামী আদর্শের জ্ঞান। ইসলাম কি, ইসলাম মানব জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করতে চায় এবং কোন্ লক্ষ্যে

পৌঁছাতে চায় এ সম্পর্কে তাকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। এক কথায় ইসলামের সঠিক পরিচয় তার কাছে তুলে ধরতে হবে।

তাকে ইসলামী শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল শিখাতে হবে। হায়েয, নেফাস, পবিত্রতা, নামায, রোযা, দান সদকা প্রভৃতি বিষয়ের বিধি বিধান শিখাতে হবে। স্বামী স্ত্রীর একান্ত সম্পর্কের নিয়ম কানুন শিখাতে হবে। শিখাতে হবে সন্তান লালন পালনের নিয়ম পদ্ধতি। সংসার পরিচালনার বিধি বিধান জানাতে হবে। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে হবে।

এগুলো শিখানো কেবল স্বামীরই দায়িত্ব নয়, বরঞ্চ স্ত্রীর নিজেরও এ ব্যাপারে পেরেশানী থাকা দরকার। তার নিজের গরজেই তাকে জ্ঞানার্জন করা উচিত। এমনকি এ ব্যাপারে স্বামী অনাগ্রহী হলেও স্ত্রীর উচিত হিকমাতের সাথে তার অনীহা ও ঔদাসীন্য উপেক্ষা করে জ্ঞানার্জন করা। কারণ পরকালে প্রত্যেককেই নিজের জবাবদিহী নিজেকেই করতে হবে। সেখানে কেউ কারো পাপের বোঝা বইবেনা।

অপরদিকে স্বামীকেও এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সদা তৎপর থাকা উচিত। বরঞ্চ তার জ্ঞানার্জনের পরিধি হওয়া দরকার আরো ব্যাপক। তাকে ব্যাপক জ্ঞানার্জনে তৎপর থাকা কর্তব্য। কারণ তার নিজের জ্ঞানের কমতি থাকলে স্ত্রীকে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। আর জ্ঞান এমন এক চমৎকার জিনিস যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা সংহতি সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বোত্তম ভূমিকা পালন করে থাকে। উভয়ের মধ্যে কিংবা কোনো একজনের মধ্যে জ্ঞানের অভাব থাকলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই এ ব্যাপারে উভয়েই উভয়ের আন্তরিক সহযোগিতা করা উচিত।

খ. ইসলামী জীবন যাপন ও ইবাদতে সহযোগিতা

উপরে যেমন বলেছি, ইসলামকে বুঝা ও জানার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সহযোগিতা করা উচিত, তেমনি ইসলাম অনুযায়ী চলার ব্যাপারেও একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করা উচিত। একজন আরেকজনকে দীনের পথে চলার জন্যে, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার জন্যে উৎসাহিত করা উচিত। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত ফরয ওয়াযিব পালনের ব্যাপারে পরস্পরকে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে যাওয়া দরকার।

স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের কতই না আপন হয়ে থাকে। কত বড় বন্ধু এবং প্রেমাস্পদই না হয়ে থাকে। তারা একজন আরেকজনের কল্যাণের জন্যে

কতইনা পেরেশান হয়ে থাকে। একজনকে খুশী করার জন্যে আরেকজন কতইনা আন্তরিক হয়ে থাকে। কে চায় এমন আপন, এমন প্রাণের টুকরো স্বামী বা স্ত্রী দোযখের দাউ দাউ করা আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে পুড়ে চরম যন্ত্রণাদায়ক আযাবে ছটফট করতে থাকুক? না কেউই তার পরম প্রিয় স্বামী বা স্ত্রীকে এ জঘন্য অবস্থায় দেখতে চাইবেনা।

কিন্তু কেবল না চাইলেই কি তা থেকে রক্ষা করা যাবে? না, কেবল চাওয়াতেই কাউকেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করা যাবেনা। এজন্যে একটিই মাত্র পথ আছে। আর তা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনেই তাকে কঠিন পরকালীন আযাব থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তাকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ বানানো সম্ভব হতে পারে। তাই আল্লাহর প্রত্যেক মুমিন বান্দাহ এবং বান্দীর কর্তব্য তার স্ত্রী বা স্বামীকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে পেরেশান হয়ে চেষ্টা করা। তাদের কর্তব্য আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর পথে একে অপরকে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করা। তাদের উচিত মনে প্রাণে একজন আরেকজনের দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করা। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাও নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ (التحريم: ٦)

অর্থাৎ তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

যে স্বামী স্ত্রী আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে পরস্পরের সহযোগিতা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তার রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَ اَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ (ابو داؤد)

"আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করেন, যে রাত জেগে নফল নামায পড়ে আর নিজ সহধর্মিনীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। আর সে যদি উঠতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। ঐ নারীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ এবং করুণা বর্ষণ করেন, যে রাত জেগে নামায পড়ে

এবং স্বামীকে জাগায়। আর স্বামী উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।"

গ. ইসলামী আন্দোলনে সহযোগিতা

যে সমাজে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানকার মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম করা। চূড়ান্ত বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে বাতিল সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে আল্লাহর দীনকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার জন্যে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো। কারণ যে সমাজে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে আল্লাহর পূর্ণ গোলামী ও আনুগত্য করা সম্ভব নয়। আর একথা স্বতসিদ্ধ যে বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র উৎখাত করে সেস্থলে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এখানে গালিচা বিছানো নেই। কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে এ কাজকে স্বাগত জানানোর মতোও কেউ নেই। এ পথ বড়ই কন্টকাকীর্ণ। এ পথে রয়েছে প্রতিটি পদে পদে কাঁটা বিছানো এ পথে রয়েছে বিরোধিতা, কষ্ট, নির্যাতন ও যুল্‌ম। এ পথে কারা নির্যাতন, এমনকি ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।

কিন্তু এতোসব বিপদ সত্ত্বেও কোনো মুসলমানই এ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারেনা। আমৃত্যু প্রতিটি মুসলমানকে এ কাজ করেই যেতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমনিদের জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে লড়বে, মরবে ও মারবে।" অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করার জন্যে এক অলংঘনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ। সুতরাং এ চুক্তি লংঘন করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়া কোনো ঈমানদার লোকের জন্যেই সমীচীন নয়।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ঈমানদার নারীর নিকটই এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তার স্বামীকে আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর সংগ্রামে অংশ নেয়া অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে স্বামীর এ মহান দায়িত্ব পালনে স্ত্রী তাকে দু'ভাবে সহায়তা করবেন ঃ

এক, স্বামী যদি তার এ গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তবে স্ত্রী ঃ

১. তাকে এ কাজে আরো অধিক অধিক উৎসাহিত করবেন।

২. জান ও মালের কোরবানীর জন্যে প্রেরণা দেবেন।

৩. তার ক্লান্তিকে প্রশান্তিময় করে দেবেন।

৪. তার সংগ্রামী জীবনের দুঃখ বেদনাময় অন্তরকে সুখ ও সান্ত্বনা দানের মাধ্যমে হালকা করে তুলবেন এবং তার সংগ্রামী চেতনাকে বলিষ্ঠ করে তুলবেন।

৫. পরিবেশ ও প্রয়োজন মতো তাকে পরামর্শ দেবেন। যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৬. বিপদে মুসীবতে নিজে ধৈর্য ধারণ করবেন এবং স্বামীকে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করবেন।

৭. স্বামী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে নিজে ভেংগে পড়বেননা। মনকে বলিষ্ঠ রাখবেন। স্বামীর সাথে সাক্ষাত করে তাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করবেন। তাকে প্রেরণাদায়ক পত্র লেখবেন।

৮. স্বামীর সংসারের হিফাযত করবেন। স্বামী যেনো সম্ভাব্য দায়িত্বসমূহ আপনার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে আন্দোলনের কাজ করে যেতে পারেন।

৯. দুঃখ দারিদ্রে সবর করবেন। সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহর শোকরগুজারী করবেন।

১০. সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবেন।

১১. সবসময় স্বামীর সুস্বাস্থ্য ও ঈমানী বলিষ্ঠতার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও মাগফিরাতের দোয়া করবেন। সর্বোপরি উভয়ের জন্যে জান্নাতের প্রার্থনা করবেন।

দ্বিতীয়ত, স্বামী যদি তার এ গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি না করে থাকেন এবং দীনি আন্দোলনে শরীক না হয়ে থাকেন, তবে স্ত্রী হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার এ গুরুদায়িত্ব তাকে বুঝাবেন। এ জন্যে তাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করবেন। নিজ অন্তরের আবেগ দিয়ে তার অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করে দেবেন। মোটকথা, স্ত্রী যদি সত্যিকার ঈমানী জযবার অধিকারী হন, তবে তার পক্ষে স্বামীর অন্তরে আল্লাহর দীনের কাজ করার জন্যে প্রেরণা যোগানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

স্ত্রীর আরেকটি দায়িত্ব হলো নিজে আন্দোলনের কাজে শরীক হওয়া। নিজেকে যেমন ইসলাম অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলতে হবে তেমনি আরো যেসব মা বোন এখনো ইসলামের সঠিক পরিচয় জানতে পারেনি তাদের কাছে নারীদেরই ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজ। নিজের আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী এবং সমাজের যেসব মহিলা এখনো দীনের আলো থেকে বঞ্চিত, এখনো যারা জাহেলিয়াতের তথাকথিত আধুনিক অন্ধকারে অভিশপ্ত জীবনযাপন করছে, যারা

এখনো শিরক ও নাস্তিক্যবাদের বস্তুবাদী সয়লাবে ভাসমান, ঈমানদার খোদাভীরু মহিলারা এগিয়ে না এলে কে এদেরকে জাহেলিয়াত ও বস্তুবাদের এ সয়লাব থেকে উদ্ধার করবে? কে তাদেরকে জাহান্নামের বঞ্চনাময় লোভাতুর গলিপথ থেকে টেনে এনে জান্নাতের রাজপথের সন্ধান দেবে? তাদের সৃষ্টিকর্তা সারা জাহানের রব মহান আল্লাহর পরিচয় তাদের নিকট কে তুলে ধরবে? পরকালের যন্ত্রণাদায়ক বীভৎস শাস্তির ভয় তাদেরকে কে প্রদর্শন করবে? অপরূপ সাজে সজ্জিত নেয়ামত আর নেয়ামতে ভরা জান্নাতের কাহিনী কেইবা তাদের শুনাবে? এ কাজ নারীদেরকেই করতে হবে। তাদের জন্যেই এটা সহজ। এ জন্যে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনে শরীক হতে হবে এবং ইসলামপন্থী নারীদের নিয়ে একটা সুন্দর ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আর সম্ভাব্য সকল নারীদের নিকট দীনের আলো পৌঁছাতে হবে। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। তাদেরকেও মুক্তির পথের সন্ধান দিতে হবে।

একজন আদর্শ স্ত্রী নিজের মুক্তির জন্যে নিজে ইসলাম অনুযায়ী চলবেন এবং অন্য নারীদেরকে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবেন। এ ব্যাপারে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে সম্ভাব্য সুযোগ প্রদান করা। নিজের ঘর সংসারের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যতটুকু সময় বাঁচানো যায় স্বামীর উচিত স্ত্রীকে সে সময়টা দীনের কাজে ব্যয় করার অনুমতি দেয়া। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ এজন্যে তাকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়াও কর্তব্য।

এভাবে আল্লাহর দীনের কাজে স্বামী স্ত্রীর একজন অপরজনকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে একটি সুন্দর সত্যিকার ইসলামী পরিবার গড়ে উঠতে পারে, যে পরিবারটি হবে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গীকৃত এবং আল্লাহ হবেন তাদের প্রতি দয়াবান।

ঘ. স্বামীর বিরোধিতায় স্ত্রী দীনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারেনা

খোদা না করুন, কোনো স্ত্রীর ভাগ্যে যদি এমন স্বামী জোটে যিনি নিজেও ইসলাম অনুযায়ী চলেননা এবং স্ত্রীকেও ইসলাম অনুযায়ী চলতে এবং ইসলামের পথে কাজ করতে দেননা সেক্ষেত্রে স্ত্রী কি করবেন? এর জবাব পরিষ্কার। এ ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী করে তাঁর কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।" যেসব নারী এ রকম স্বামীর হাতে পড়বেন তাদের জন্যে কুরআনে

একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে ঃ

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - (التحريم : ١١)

"ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সে যখন ফরিয়াদ করছিলো ঃ ওগো আমার রব! তোমার নিকট জান্নাতে আমাকে একটি ঘর বানিয়ে দাও, আর ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে এবং যালেম কওম থেকে আমাকে রক্ষা করো।" (আত্ তাহরীম ঃ ১১)

এ পর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ দৃষ্টান্তটিই মুমিন মহিলাদের জন্যে আমি যথেষ্ট মনে করি। ফেরাউন ছিলো মিশরের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক। তারই ঘরে তারই স্ত্রী ঈমানের পথে চলছে, আল্লাহর পথে চলছে, চলছে ইসলামের পথে, নবীর পথে। ফেরাউন তা বরদাশত করতে পারেনা। চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালায় সে স্ত্রীর উপর। কিন্তু কোনো অত্যাচার নির্যাতনই তাঁকে তাঁর খোদার পথ থেকে টলাতে পারেনা। তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান। ফেরাউনের রাজপ্রাসাদকে তিনি তুচ্ছ মনে করেন। রাজপ্রাসাদ তিনি চাননা। তিনি চান জান্নাতে একটি ঘর। পরকালীন সুখ শান্তি ও মুক্তি। বস্তুত তাঁর নীতি প্রতিটি ঈমানদার মহিলার জন্যে অনুসরণযোগ্য।

ঙ. বদনসীব স্ত্রী

আরেক ধরনের নারী রয়েছে যারা খুবই বদনসীব। এরা হছে সেইসব নারী যাদের স্বামী আল্লাহর পথের সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জীবনকে ইসলাম থেকে দূরে রাখে। ইসলামের সুমহান বিধান তাদের জীবনকে স্পর্শও করেনা। তাদের স্বামীরা খোদার পথে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও তারা আখিরাতের চিরন্তন কল্যাণ লাভ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে। এরা হচ্ছে সেইসব বদনসীব, যাদের স্বামীরা খাঁটি মুসলমান। কিন্তু তারা ইসলামের পথে চলতে রাজী নয়। স্বামীর খাঁটি মুসলমানদের মতো চলাটাকেও তারা পছন্দ করেনা। স্বামী ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক। কিন্তু তারা স্বামীর দীনি কাজে কোনো প্রকার সহযোগিতা করেনা। স্বামীর দুঃখ বেদনায় শরীক হওয়া তো দূরের কথা বরঞ্চ স্বামীকে আরো তিরস্কার করে। স্বামীর দীনি কাজকে নিন্দা করে। স্বামীর ইসলামের পথে চলাকে ঘৃণা করে। পদে পদে স্বামীর মনে কষ্ট দেয়। এ কারণে সঠিকভাবে স্বামীর খেদমত করেনা। স্বামীর প্রতি আন্তরিকতা

পোষণ করেনা। হয়তো বা স্বামীর বিরোধিতাও করে। স্বামীকে জ্বালাতন করে। হয়তো বা স্বামীর খেয়ানতও করে।

এরা বাস্তবিকই বড় বদনসীব। এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের স্ত্রী হয়েও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ রকম দু'জন নারীরই দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। তারা ছিলেন দু'জন নবীর স্ত্রী। কিন্তু তারা নবীর পথে চলাকে পছন্দ করেনি। বরং আল্লাহর পথের সৈনিক হবার কারণে এরা তাঁদের স্বামীদের সাথে গাদ্দারী করেছে। এদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন ঃ

"আল্লাহ অমান্যকারীদের ব্যাপারে নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। এরা আমার দু'জন নেক বান্দার স্ত্রী ছিলো। কিন্তু তারা (দীনের ব্যাপারে) তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে সক্ষম হলনা। দু'জনকেই বলে দেয়া হলো ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।"(আত্ তাহরীম ঃ ১০)

ক. পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক

বিবাহের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান। হযরত আদম আলাইহিস সাল্লাম এর স্ত্রী হিসাবে হাওয়াকে সৃষ্টি করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ উদ্দেশ্যই সম্পাদন করেছেন ঃ

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً -

"তাদের দু'জন থেকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী।" তাই বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী প্রতিনিয়ত বিয়ের এ মহান উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তারা কোনো অবস্থাতেই শরীয়ত সম্মত কোনো কারণ ব্যতিত জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেননা।[১] আল্লাহ তা'আলা সন্তান লাভের আকাঙ্খাকে মানুষের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। সন্তান লাভ বিবাহিত দম্পতির এক দুর্নিবার আকাঙ্খা। এক চরম তৃপ্তি ও আনন্দ এবং পরম সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

"সম্পদ ও সন্তান সন্ততি এই দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।" (সূরা কাহাফ ঃ ৪৬)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ -

"মানুষের জন্যে তাদের মনোপূত জিনিস স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি বড়ই আনন্দদায়ক বানিয়ে দেয়া হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

সন্তান কন্যা হোক কিংবা পুত্র হোক পিতামাতার নিকট উভয়ই সমান মর্যাদাশীল হতে হবে। পুত্র সন্তান হলে অধিক আনন্দ এবং কন্যা সন্তান হলে নিরানন্দ ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহের কাজ। ইসলাম বরং কন্যা সন্তানকে সুন্দরভাবে লালন পালন করাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায় বলে আখ্যায়িত করেছে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যাকে এই কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়, সে যদি তাদের সাথে

---

১. জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ইসলামের বিধান জানার জন্যে মওলানা মওদূদীর 'জিবতে বেলাদত' গ্রন্থ পড়ুন। গ্রন্থটির বাংলা নাম হচ্ছে ঃ 'ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ'। -গ্রন্থকার

সদয় আচরণ করে, উত্তমভাবে তাদের লালন পালন করে, তবে এ কন্যারাই তার জন্যে জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হবে।" (বুখারী, এন্তেখাবে হাদীস)।

যাহোক পিতামাতা ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে গড়ে উঠে পরিবার। রক্ত সম্পর্কের নিবিড় বন্ধনে তারা একে অপরের একান্ত আপন হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের একের জন্যে অপরের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন স্নেহ আদর ও মহব্বত ভালোবাসার স্রোতধারা যা কখনো শেষ হয়না, শুকিয়ে যায়না। তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। একজন আরেকজনের নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা সন্তানের জন্যে পিতামাতার উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন। আবার সন্তানের উপরও পিতামাতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সকল মুসলমান পিতামাতা ও সন্তানেরই আল্লাহ ও রসূল নির্ধারিত এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

সন্তান সন্ততি যখন অকর্মণ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে, সে অবস্থায় তাদের যাবতীয় বিষয়ের দায়দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার উপর ন্যস্ত করেছেন। আবার সন্তানেরা বুঝ জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে কর্মঠ হবার পর তাদের উপর পিতামাতার প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। ইসলাম সন্তান ও পিতামাতা সকলকেই তাদের অসহায় অবস্থায় সবচাইতে আপনজনের উপর তাদের দেখাশুনা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করে।

খ. সন্তানদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তানের প্রতি পিতামাতার বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা গেলো ঃ

১. সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ

পিতামাতা কোনো অবস্থাতেই, কোনো কারণেই সন্তান হত্যা করতে পারবেনা, এমনকি চরম দারিদ্রের ভয় থাকলেও নয় ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ
اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا - (بنى اسرائيل : ٣١)

"দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। তাদের জীবিকা আমিই যোগাবো আর তোমাদের জীবিকাও। জেনে রাখো, সন্তান হত্যা করা জঘন্য অপরাধ" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)

আল্লাহ তা'আলা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারীদের বায়আত গ্রহণকালে তাদের যেসব বিষয়ে শপথ করার শর্তারোপ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সন্তান হত্যা না করার শপথ ঃ

"আর (নারীরা যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে) তারা তাদের সন্তান হত্যা করবেনা তবে আপনি তাদের বায়আত গ্রহণ করুন।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)

আমাদের নিকট পরিষ্কার হলো, আল্লাহ মুসলমান পিতামাতার জন্যে তাদের সন্তান হত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছেন। অকারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত কিংবা জ্যান্ত হত্যা যেভাবেই সন্তান নিধন কাজ সম্পন্ন করা হোক না কেন তা আল্লাহর নিকট জঘন্য অপরাধ মহাপাপ।

২. কানে আযান দেয়া

সন্তান জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তার কানে আযান দেয়া সুন্নাত। আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ

"ফাতিমা হুসাইনকে প্রসব করার পর আমি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কানে নামাযের আযান দিতে শুনেছি।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

৩. আকীকা করা ও নাম রাখা

সন্তান জন্মের পর তার জন্যে আকীকাহ করা এবং তার নাম রাখা পিতা মাতার দায়িত্ব। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক নবজাতক তার আকীকার সাথে বন্দী থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবাই করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা কামিয়ে ফেলা হবে।" (তিরমিযী)

আকীকার গুরুত্ব বুঝানোর জন্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বন্ধক' থাকার কথা বলেছেন। আকীকা দিলে শিশু বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক সামর্থবান পিতামাতারই সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা দেয়া উচিত। আকীকা সপ্তম দিনে করাই উত্তম। তা সম্ভব না হলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় করলেও হবে। তাও সম্ভব না হলে জীবনে যে কোনো সময় করলেই হবে। ছাগল দিয়ে অকীকা দেয়া হলে পুত্র সন্তানের জন্যে দুটি এবং কন্যা সন্তানের জন্যে একটি দিতে হবে।

সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখাও পিতামাতার দায়িত্ব। হাদীসে এসেছে আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান প্রভৃতি আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত নামসমূহ

আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

সপ্তম দিনের মাথায় সন্তানের মাথা মুণ্ডন করে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ও পিতামাতার দায়িত্ব। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতী হাসানের পক্ষ থেকে (আকীকার) পশু যবাই করে কন্যাকে বলেছিলেন, "হে ফাতিমা! ওর মাথা মুণ্ডন করে ফেলো এবং তার মাথার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য দান করো।"

৪. তাহনীক ও খতনা করা

সদ্যজাত শিশুকে মিষ্টিমুখ করানোকে হাদীসে তাহনীক বলা হয়েছে। কয়েকটি হাদীস থেকে জানা যায়, কয়েকজন মহিলা সাহাবী সন্তান প্রসবের পর তাদের সন্তান এনে রসূলে করীমের কোলে দিয়েছেন। তিনি নবজাতকদের কোলে নিয়ে আদর করেছেন। খেজুর চিবিয়ে মিষ্টি রস তাদের মুখে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে বরকতের দোয়া করেছেন। আবার কখনো এ সাথে কোনো কোনো বাচ্চার নাম রেখে দিয়েছেন। এ রকম একটি শিশু একবার নবী করীমের জামায় পেশাবও করে দিয়েছিলো।

শিশু পুত্রের পুরুষাংগের বর্ধিত চর্ম কর্তন করাকে 'খতনা' বলা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খতনা করা সকল নবীর সম্মিলিত সুন্নাত।

৫. স্নেহ মমতা

সন্তানের প্রতি পিতামাতার মমত্ববোধ একটি চিরন্তন প্রকৃতিগত ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ -

"স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে ভালোবাসা মানুষের জন্যে সৌন্দর্যময় করে দেয়া হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ছোটদের আদর মমতা করবেনা সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।' সুতরাং পিতামাতার আদর যত্ন ও ভালোবাসা লাভ সন্তানের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার থেকে পিতামাতা তাদের কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারেনা।

৬. দুধ পান করানো

মায়ের কর্তব্য হচ্ছে তিনি সন্তানকে দুধপান করাবেন। মায়ের স্তনে আল্লাহ

তা'আলা সন্তানের এ অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন। দারুণ কষ্ট ও দুর্বলতার মধ্য দিয়েও সন্তানকে দুধপান করাতে হয় মায়ের। আল্লাহ তা'আলা মায়েদের প্রতি অত্যন্ত দরদ নিয়েই এ কথাটি কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন ঃ

"তার মা তাকে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সইয়ে পেটে বহন করেছে আর দুটি বছর লেগেছে তার দুধ ছাড়াতে।" (সূরা লোকমান ঃ ১৪) কুরআন মজীদের অপর স্থানে বলা হয়েছে ঃ

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে। এ বিধান তার জন্যে যে দুধপানের মেয়াদ পুরা করতে চায়"। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৩)

৭. লালন পালন ও ভরণ পোষণ

সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব পিতামাতার। তারা সন্তানের লালন পালন করবেন, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের খাদ্য ও পোষাক দেবেন। পিতামাতার উপর সন্তানের এ এক জন্মগত অধিকার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"কোনো ব্যক্তির গুনাহগার হবার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে সে নিজ পোষ্যদের ভরণ পোষণে অবহেলা করবে।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - (متفق عليه)

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সন্তুটির জন্যে স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যে যা কিছু ব্যয় করা হয় সেটাকেও ছদকা বা উত্তম দান বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"যে দীনার দান করলে তুমি আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে, যে দীনার দান করলে ক্রীতদাসের আযাদীর জন্যে, যে দীনার দান করলে দরিদ্র মিসকীনের হাতে, আর যে দীনার ব্যয় করলে নিজ পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণে এসবের মাঝে শ্রেষ্ঠতম প্রতিদান পাবে সে দানের, যা ব্যয় করলে আপন পরিবার পরিজনের প্রতিপালনের জন্যে।" (মুসলিম)

৮. শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠন

মুসলমান পিতামাতাকে সন্তানের দীনি শিক্ষা ও দীনি চরিত্র গঠনের ব্যাপারেও আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। পিতামাতার উপর এটা

সন্তানের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে কেউই নিজ সন্তানদের বঞ্চিত করতে পারেনা।

সন্তানদের কুরআন, ঈমান আকীদা, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ে প্রথমে শিক্ষা দান করতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে তাদেরকে পরিষ্কার নির্ভুল ধারণা দিতে হবে। ইবাদতের নিয়ম কানুন তাদের শিখাতে হবে। যেমন, নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতসমূহের তালীম তাদের প্রদান করতে হবে।

তাদের উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হবে। ইসলামী আদব কায়দা ও আচার অনুষ্ঠান তাদের শিখাতে হবে। মোটকথা সর্বদিক থেকে তাদেরকে আদর্শ মুসলমান বানানোর চেষ্টা করতে হবে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম কিছুই মা বাপ সন্তানদের দান করতে পারেনা।" (তিরমিযী)

পিতামাতার অবহেলার কারণে সন্তান প্রকৃত মুসলমান হতে না পারলে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দরবারে পিতামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে।

৯. সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার

পিতামাতার উপর সকল সন্তানের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা দান ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানদের মঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করবেন। সকলের সমান কল্যাণ কামনা করবেন। কারো প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বেননা এবং কাউকেও বঞ্চিত করবেননা। ন্যায় ও সুষম নীতি অবলম্বন করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ. اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ - (مسند احمد)

"তোমাদের সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।" (মুসনাদে আহমদ)

এ সম্পর্কে একটি মশহুর ঘটনা রয়েছে। প্রায় সবগুলো সহীহ হাদীসগ্রন্থে নুমান ইবনে বশীরের বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ হযরত বশীর আনসারীর স্ত্রী উমরাহ তার পুত্র নুমান ইবনে বশীরকে একটা বাগান বা ক্রীতদাস দান করার জন্যে স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন। এতে হযরত বশীর ঐ ছেলেকে তা দান করেন। কিন্তু নুমানের মা (এ দানকে পাকাপোক্ত করার জন্যে)

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখার দাবি করেন। সে মতে তিনি নুমানকে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ওগো আল্লাহর রসূল! আমি আমার স্ত্রী উমরাহর গর্ভজাত এ পুত্রকে (নুমানকে) একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু উমরাহ এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তোমার সব ছেলেকে অনুরূপ দান করেছো? তিনি বললেন ঃ জী না। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো। সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করো। আমি এ যুল্‌মের সাক্ষী হতে পারবোনা। অতপর হযরত বশীর ফিরে এসে তার দান ফেরত নিলেন। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

সন্তানদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্যায়ে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, কন্যা সন্তান হোক কিংবা পুত্র সন্তান উভয় অবস্থাতেই পিতামাতা সমভাবে খুশী হবেন। কোনো অবস্থাতেই, কোনো পদ্ধতিতেই সন্তান হত্যা করবেননা। সন্তান জন্মের পর কানে আযান দেবেন। সুন্দর ইসলামী নাম রাখবেন। আকীকার ব্যবস্থা করবেন। তাহনীক করাতে চেষ্টা করবেন। খতনা করাবেন। আদর স্নেহ করবেন। মা দুধপান করাবেন। লালন পালন করবেন। পিতা সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করবেন। দীনি শিক্ষা প্রদান করবেন। উত্তম নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবেন। সর্বোপরি তাদের মাঝে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

গ. পিতামাতার অধিকার

মানুষের সবচাইতে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তার অধিকার আদায় করা। আল্লাহ ও রসূলের পরেই মানুষের উপর সবচাইতে বড় অধিকার হলো মাতাপিতার অধিকার। মানুষের সর্বাধিক সহযোগিতা ও সেবা যত্ন পাবার অধিকারী হলেন তাদের মা ও বাপ। মা বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। পিতামাতার এ অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। তাই এ পর্যায়ে কুরআন হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতিই আমি যথেষ্ট মনে করছি ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ

الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا (بنى اسرائيل: ٢٣-٢٤) -

"তোমার খোদা ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করবেনা। পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমার নিকট যদি তাদের কোনো একজন কিংবা দু'জনই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে. তবে তুমি তাদের 'উহ' পর্যন্ত বলবেনা। তাদের ভর্ৎসনা করবেনা। বিশেষ সম্মানের সাথে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। তাদের সম্মুখে নম্র ও বিনয়াবনত থাকবে। আর তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকবে ঃ প্রভু, তাঁদের প্রতি রহম করো, যেমনি করে তাঁরা বাল্যকালে আমাকে পরম স্নেহ মমত্ববোধের সাথে পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

সূরা আহকাফে বলা হয়েছে ঃ

"আমরা মানুষকে তাকীদ করেছি, তারা যেনো পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার মা নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে তাকে প্রসব করেছে।"

সূরা নিসাতে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা আর পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো।" (আয়াত ৩৬)

সূরা লোকমানে বলা হয়েছে, পিতামাতা যদি মুশরিকও হয় তবু তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের কষ্ট ভোগের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কেবলমাত্র তাদের শিরকের প্রতি আহবানকে বর্জন করতে হবে। বলা হয়েছে ঃ

"আমার শোকর আদায় করো আর তোমার পিতামাতার। তারা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে তোমার উপর জোর প্রয়োগ করে যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করবেনা। কিন্তু ইহজীবনে তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে।" (আয়াত ঃ ১৪)

সূরা আনকাবুতের অষ্টম আয়াতেও এই একই কথা বলা হয়েছে। এবার এ সম্পর্কে রসূলে করীমের কতিপয় বাণী উদ্ধৃত করছি ঃ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার ভালো ব্যবহার পাবার সবচাইতে বেশী অধিকারী কে? তিনি বলেন ঃ তোমার

মা। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ অতপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে বললো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে জানতে চাইলো ঃ এরপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা। (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহর নিকট সবচাইতে পছন্দনীয় আমল কি? তিনি বললেন ঃ সময়মত নামায আদায় করা। আমি বললাম ঃ তারপর কি? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা। আমি বললাম ঃ অতপর কোন্ আমল? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতামাতাকে জান্নাত ও জাহান্নাম লাভের মাধ্যম হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

সে ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য (তিনবার)! জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে সে ব্যক্তি ওগো আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতা দু'জনকেই কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও জান্নাতবাসী হতে পারলোনা।" (মুসলিম)

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

"পিতা বেহেশ্‌তে প্রবেশের মাধ্যম।" (মুসনাদে আহমদ)

কোথাও বলেছেন ঃ "তোমার পিতামাতা তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।"

পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"কোনো ব্যক্তির নিজ পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়াও বড় কবীরা গুনাহ।" সন্তানের উপার্জনে পিতামাতার হক আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সন্তান পিতামাতার উত্তম উপার্জন বিশেষ। সুতরাং হে পিতামাতা! তোমরা সন্তানের সম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে পানাহার করো।" (মুসনাদে আহমদ)

পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সন্তানের কোনো কর্তব্য এবং সন্তান কর্তৃক তাদের কল্যাণকর কিছু করার থাকে কিনা– এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"হাঁ তাদের মৃত্যুর পরও চার পন্থায় তাদের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারো এবং তাদের কল্যাণ করতে পারো ঃ ১. তাদের জন্যে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে ২. তাদের কৃত ওয়াদা ও অসীয়ত পূর্ণ করে ৩. তাদের বন্ধু

বান্ধবদের সম্মান করে এবং ৪. তাদের সূত্রে যারা তোমার আত্মীয় হয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে।" (আদাবুল মুফরাদ)। পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের এসব উদ্ধৃতি থেকে আমরা যা কিছু জানতে পারলাম তা হচ্ছে ঃ

১. গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে পিতামাতার মর্যাদা সর্বোচ্চ।

২. পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার ও তাদের সেবা যত্ন করা আল্লাহর অলংঘনীয় নির্দেশ।

৩. তাদের বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলা যাবেনা।

৪. তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে আদবের সাথে, আচরণ করতে হবে সম্মানজনকভাবে।

৫. তাদের নিকট সবসময় নম্র ও বিনীত থাকতে হবে।

৬. তাদের জন্যে আল্লাহর শিখানো ভাষায় দোয়া করতে হবে। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৭. পিতামাতা যদি শিরকের দিকে নিয়ে যেতে চায়, সে অবস্থায় তাদের আনুগত্য করা যাবেনা। তবে মুশরিক পিতামাতার সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে।

৮. পিতার চাইতে মায়ের অধিকার তিন গুণ বেশী। মায়ের পরই পিতার অধিকার।

৯. পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা বড় কবীরা গুনাহ।

১০. পিতামাতার অকৃতজ্ঞ হওয়া জাহান্নামের কাজ।

১১. তাদের শোকরিয়া আদায় করা জান্নাত লাভের উপায়।

১২. তাদেরকে অভিশাপ দেয়া কবীরা গুনাহ।

১৩. সন্তানের উপার্জিত সম্পদে তাদের অধিকার আছে।

১৪. তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্যে দোয়া করতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে। তাদের ওয়াদা অসীয়ত পূরণ করতে হবে। তাদের বন্ধু বান্ধবদের তাযীম করতে হবে এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতে হবে।

সাতঃ পর্দা

ক. পর্দার পরিচয়

পর্দা হচ্ছে ভিন পুরুষ ও ভিন নারী থেকে নিজের মন মানসিকতা, চোখ, কান ও যবানকে হিফাযত করে যৌন জীবনকে পবিত্র রাখা। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়ের জন্যেই পর্দা ফরয করেছে।

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক। আল্লাহ মানুষের সম্মানজনক ও মর্যাদাব্যাঞ্জক জীবন যাপনকে ভালোবাসেন। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে সমাজে মানুষের পাশবিক কামনা বাসনাকে উশৃঙ্খল করে তোলা মানুষের জন্যে খুবই অমর্যাদাকর। এটা মানবত্ব নয়, পশুত্ব।

পশু বিবেকহীন। মানুষ বিবেকসম্পন্ন, বুদ্ধিমান। তাই উভয়ের নীতি ও আচরণে অবশ্যি পার্থক্য থাকতে হবে। কেবল মানবিক অবয়বের কারণেই কেউ মানুষ হতে পারেনা। তাকে মানুষ হতে হয় নীতি ও আদর্শের দিক থেকে। তার নীতি ও আচরণ হতে হবে বিবেক বুদ্ধি সম্মত।

তাই মানুষ যেনো তার জৈবিক ও পাশবিক শক্তিকে সুশৃঙ্খল রেখে যথার্থ মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সেজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বোত্তম নিয়মনীতি ও আইন বিধান দিয়ে দিয়েছেন। কেবলমাত্র সেসব নিয়ম কানুন অনুসরণের মাধ্যমেই তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

পর্দা ব্যবস্থা আল্লাহর এমন একটি উত্তম বিধান, যা মানুষকে পাশবিক উশৃঙ্খলতা থেকে হিফাযত করে এবং মানবিক মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে।

খ. পর্দার উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত পর্দা ব্যবস্থায় মানুষের বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে ঃ

১. এ ব্যবস্থা মানুষের যৌন জীবনকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করে;

২. যিনা ব্যভিচার, ধর্ষণ প্রভৃতি নোংরামি বন্ধ হয়;

৩. এসব নোংরামী থেকে সৃষ্ট যৌন রোগ থেকে মানুষ রেহাই পায়;

৪. মানব বংশ পূতপবিত্র থাকে;

৫. নারী পুরুষের অন্তরে অসংগত মানসিক চিন্তা সৃষ্টি হয়না;

৬. এতে দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি পায়;

৭. এতে নারীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে;

৮. পর্দা মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে;

৯. লজ্জা মানবত্বের প্রতীক। পর্দা মানুষের লজ্জা সংরক্ষণ করে;

১০. পর্দা মানব মর্যাদার প্রতীক;

১১. পর্দা আভিজাত্যের প্রতীক;

১২. পর্দা মর্যাদা বৃদ্ধি করে;

১৩. পর্দা সমাজ জীবনকে সুস্থ রাখে। এ ছাড়াও পর্দা ব্যবস্থায় আরো অনেক কল্যাণ নিহিত আছে।

গ. পর্দার বিধান

কুরআন মজীদে পর্দা সংক্রান্ত যেসব নির্দেশাবলী রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু নির্দেশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণকে সম্বোধন করে দেয়া হয়েছে। আর কিছু নির্দেশ এসেছে সর্বসাধারণ মুমিন নারী ও পুরুষদের সম্বোধন করে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, উম্মুল মুমিনীনদের সম্বোধন করা পর্দা সংক্রান্ত যেসব নির্দেশাবলী নাযিল হয়েছে, সেগুলো দুনিয়ার সকল মুমিন নারীদের জন্যেও প্রযোজ্য। তাঁদের সম্বোধন করার দুটো মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে ঃ এক, সংশোধন স্বয়ং নবী পাকের ঘর থেকে আরম্ভ করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল। দুই, নবী পাকের বিবিগণ যেহেতু সমস্ত মুমিন নারীদের আদর্শ ছিলেন সেজন্যে তাঁদেরকে সম্বোধন করে পর্দার বিধান নাযিলের সূচনা করা হয়েছে। আসলে সম্বোধন যাদেরই করা হোক না কেন, এ সংক্রান্ত প্রতিটি নির্দেশ সকল নারী ও পুরুষকেই মেনে চলতে হবে।

ঘ. পর্দার প্রাথমিক নির্দেশ

"হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে (লোকদের সাথে) কোমল মিষ্টি সুরে কথা বলোনা। এতে দুষ্ট মনের কোনো লোক লালসায় পড়তে পারে। কথা বলবে সোজাসুজি স্পষ্ট। নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজগোজ প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। সালাত আদায় করো। যাকাত পরিশোধ করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বাইত! আল্লাহ তোমাদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে তোমাদেরকে পূত পবিত্র রাখতে চান।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৩)

ঙ. দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশাবলী

"হে ঈমানদারেরা! বিনা অনুমতিতে তোমরা নবীর ঘরে ঢুকে পড়োনা। নবীর বিবিদের নিকট থেকে কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চেয়ে পাঠাবে। তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার এটাই উত্তম পন্থা। নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে সাধারণ মেলামেশার নারী ও তাদের ক্রীতদাসেরা আসা যাওয়া করবে, এতে কোনো দোষ নেই। হে নারী সমাজ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো। আল্লাহ সবকিছুর উপর দৃষ্টিবান।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩-৫৫)

চ. তৃতীয় পর্যায়ের নির্দেশ

"হে নবী! তোমার বিবি, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দাও, তারা যেনো নিজেদের উপর তাদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা খুবই উত্তম নিয়ম রীতি, যাতে তাদের (সম্ভ্রমশীলতা) চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)

ছ. শেষ পর্যায়ের নির্দেশাবলী

"হে ঈমানদার লোকেরা! নিজের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবেনা যতোক্ষণ না অনুমতি পাবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর পন্থা। আশা করা যায়, তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে অনুমতি পাবার আগে তাতে প্রবেশ করোনা। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তবে ফিরে চলে যাও। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ ভালো করেই জানেন। অবশ্য এমনসব ঘরে প্রবেশ করা তোমাদের জন্য দূষণীয় নয়, যা কারো বাসস্থান নয় এবং সেখানে তোমাদের কোনো কাজের সামগ্রী রয়েছে। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু করো গোপন সবই আল্লাহর জানা আছে। হে নবী, মুমিন পুরুষদের বলে দাও ঃ তারা যেনো নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, এটা তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী! মুমিন নারীদেরও বলে দাও ঃ তারা যেনো নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং সাজ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ব্যতীত। তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের উপর আঁচল (বা ওড়না) ফেলে রাখে। তারা যেনো এই লোকদের

ছাড়া আর কারো সামনে নিজের সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে ঃ তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, নিজেদের মেলামেশার মহিলারা, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যারা বিনীত নির্লিপ্ত আর সেইসব কিশোর যারা নারীদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি। আর তারা যেনো যমীনের উপর নিজেদের পা মেরে মেরে আওয়াজ করে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য লোকেরা জানতে না পারে। হে মুমিনরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর (বিধানের) দিকে প্রত্যাবর্তন করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা নূর ঃ ২৭-৩১)

জ. আরো কতিপয় নির্দেশ

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের দাস দাসী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা তিনটি সময় অবশ্যি যেনো অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে ঃ ফজর নামাযের পূর্বে, দুপুরের বিশ্রামের সময় আর এশার নামাযের পরে। এ তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এ ছাড়া অন্যান্য সময় তারা বিনা অনুমতিতে আসলে তাতে তোমাদের বা তাদের কোনো দোষ হবেনা। পরস্পরের নিকটতো তোমাদের বার বার যাওয়া আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করে থাকেন। তিনি সবই জানেন। তিনি সুকৌশলী। আর তোমাদের বাচ্চারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন অবশ্যি তারা যেনো তেমনভাবে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, যেমন করে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি সর্বজ্ঞ সুকৌশলী। আর যেসব নারী নিজেদের যৌবনকাল অতিবাহিত করে ফেলেছে, বিয়ে করার কোনো আকাঙ্খা নেই, তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের জন্যে কোনো দোষ হবেনা। অবশ্য শর্ত এই যে, তারা রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারিণী হবেনা। তা সত্বেও তারা যদি নিজেদের লজ্জাশীলতাকে রক্ষা করে, তবে তা তাদের জন্যেই কল্যাণময় হবে। আল্লাহ সব কিছু জানেন ও শুনেন।" (সূরা নূর ঃ ৫৮-৬০)

ঝ. পর্দার নির্দেশাবলীর বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'আলা বড়ই বিজ্ঞ ও সুকৌশলী। তিনি এসব আয়াতে মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র হিফাযতের পরিপূর্ণ বিধান নাযিল করে দিয়েছেন। এসব আয়াত থেকে পর্দা সংক্রান্ত যেসব বিধান পেলাম এখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে সেগুলো সাজাবো। এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করবো ঃ

১. পুরুষদের সাথে নারীরা নরম কোমল ভাষায়, মিষ্টি সুরে কথা বলতে পারবেনা। কারণ এতে পুরুষদের মনে লালসার উদ্রেক হতে পারে।

২. নারীরা ঘরে অবস্থান করবে। এটাই তাদের প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র। এটাই তাদের কর্মক্ষেত্র। এটাই তাদের নিরাপদ স্থান, স্বভাবসম্মত পরিবেশ। তবে, ইসলাম প্রয়োজনে মেয়েদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করে। নামাযের জামায়াতে, জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দীনি কাজে এবং সাংসারিক জরুরী প্রয়োজনে মেয়েরা বাইরে যেতে পারবে। সাহাবী মহিলাগণ এসব কাজে বের হতেন। এমনকি তাঁরা আপনজনদের সঙ্গে যুদ্ধেও শরীক হয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

قَدْ أَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ -

"তোমাদের প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।" (বুখারী)

জরুরী প্রয়োজনে মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ঃ

ক. দূরের পথ হলে কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে নিতে হবে।

খ. সাজ গোজ প্রদর্শন করা যাবেনা। অলংকারের ঝন্‌ঝনানি শুনানো যাবেনা।

গ. পুরুষদের থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে হবে।

ঘ. চাদর দিয়ে পূর্ণ শরীর ঢেকে নিবে। এ উদ্দেশ্যে বোরকা প্রথা চালু হয়েছে।

ঙ. এমন কোনো পাতলা কাপড় পরা যাবেনা যাতে শরীর দেখা যাবে।

চ. বস্ত্র এতোটা আঁটসাট হবেনা, যাতে শরীরে বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ পরিলক্ষিত হবে।

ছ. কোনো ভিড়ের মধ্যে পুরুষদের সাথে মাখামাখি ও ঢলাঢলি করবেনা।

জ. সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবেনা। সেটা সেন্ট, আতর, স্নো পাউডার যে আকারেই হোক না কেনো।

ঝ. কারো সাথে কথা বলতে হলে, কথায় কোনো প্রকার লালিত্য থাকবেনা।

ঞ. কোনো প্রকার পুরুষালি পোষাক পরে বের হবেনা এবং অমুসলিমদের পোষাকও নয়।

ট. সর্বোপরি লজ্জা এবং খোদার ভয় নিয়ে তাকে বের হতে হবে। কোনো মুসলিম নারী যখন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে, তখন তাকে উপরোক্ত

শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। কুরআন এবং হাদীসে তাদের জন্যে এসব শর্তারোপ করা হয়েছে।

৩. পর্দার নির্দেশাবলী প্রসঙ্গে আমরা তৃতীয় যে বিধানটি পেলাম তা হচ্ছে ঃ বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা যাবেনা। কেবলমাত্র অনুমতি পেলেই প্রবেশ করতে হবে। ফিরে যেতে বলা হলে ফিরে যাবে। একে একে তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি চাওয়া সুন্নাত। তৃতীয় বারেও অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে। ঘরের মহিলাদের নিকট কিছু চাইতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চাইতে হবে।

৪. নারীরা নিজেদের নিকটাত্মীয়, শিশু ও অধীনস্থদের ব্যতীত অন্য কারো নিকট নিজেদের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করবেনা।

৫. বাইরে যেতে হলে চাদর (বা বোরকা) দিয়ে নিজেদের শরীরকে পুরোপুরি ঢেকে নেবে।

৬. মেয়েরা বাইরে বেরোবার সময় নিজেদেরকে পূর্ণরূপে ঢেকে নেবার পর তাদের যতোটুকু সৌন্দর্য আপনাতেই প্রকাশ হয়ে থাকে, তাতে কোনো দোষ নেই।

"আপনাতেই প্রকাশ হওয়া সৌন্দর্য" সম্পর্কে অতীতের ওলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সম্মুখ আলোচনা আসছে।

৭. কোনো বসবাসের স্থান নয়, এমন ঘরে পুরুষরা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে, যদি সেখানে তাদের কোনো মাল সামগ্রী থাকে।

৮. পুরুষকে নারী থেকে নিজের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে হবে আর নারীকে পুরুষ থেকে নিজের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে হবে এবং উভয়কে নিজেদের লজ্জাস্থান হিফাযতে সতর্ক থাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا النَّظَرُ - (بخارى)

"মানুষের চক্ষুদ্বয়ও যিনা করে আর চোখের যিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত।" তিনি হযরত আলীকে বলেছেন ঃ

"হে আলী! একবার দৃষ্টি পড়ে যাবার পর পুনরায় দৃষ্টি ফেলবেনা।

প্রথমবারই দেখতে পারো, দ্বিতীয়বার নয়।"

অর্থাৎ কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাবার পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও, পুনরায় তাকাবেনা। একজন সাহাবী হঠাৎ পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন ঃ

اَصْرِفْ بَصَرَكَ -

"তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।" (আবু দাউদ)

আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে লিখেছেন ঃ

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ سَمٌّ اِلَى الْقَلْبِ -

"দৃষ্টি এমন একটি তীর যা মানুষের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েই থাকে।"

৯. চলা ফেরার সময় মেয়েদেরকে খুবই সংযত ও বিনীত হয়ে চলতে হবে। চলার সময় পায়ের আওয়াজ শুনা যেতে পারবেনা, অলংকারের আওয়াজ শুনা যেতে পারবেনা।

১০. শয্যা ও বিশ্রাম গ্রহণের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদেরকেও অনুমতি নিয়ে পিতামাতার নিকট যেতে হবে। চাকর চাকরাণীদেরকেও। বয়স্ক সন্তানদেরকে তো অবশ্যই অনুমতি নিয়ে পিতামাতার কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।

১১. যৌন বাসনাহীন বৃদ্ধা মহিলাদের কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়েছে। সৌন্দর্য প্রকাশের নিয়্যত না থাকলে তারা অবগুণ্ঠন ছাড়া থাকতে পারে। কিন্তু পর্দার বিধান মেনে চলাই তাদের জন্য উত্তম।

ঞ. যাদের সম্মুখে নারীরা সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে

কুরআন মজীদে মেয়েদেরকে ভিন্ পুরুষের সম্মুখে নিজেদের সাজ সৌন্দর্য ও রূপ প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেদের কান, চুল, গ্রীবা, ঘাড়, পায়ের নলা ইত্যাদি ভিন্ পুরুষদের সামনে প্রকাশ করবেনা। আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব গোপন সৌন্দর্য কেবলমাত্র বার প্রকার লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘরে এ বার প্রকার লোকদের সম্মুখে তারা নিজেদের এসব সাজ সৌন্দর্য উন্মুক্ত রেখে চলাফেরা করতে পারবে। তারা হচ্ছে ঃ

১. তাদের স্বামী। (অবশ্য স্বামীর জন্যে স্ত্রী-দেহের যে কোনো অঙ্গ দেখা জায়েয)।

২. তাদের পিতা (দাদা, পরদাদা এবং নানাও এর অন্তর্ভুক্ত)।

৩. স্বামীর পিতা। অর্থাৎ শ্বশুর।

৪. তাদের পুত্র এবং কন্যা ও পুত্রের পুত্র। অর্থাৎ নাতি।

৫. স্বামীর পুত্র। অর্থাৎ স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬. তাদের ভাই। আপন হোক কিংবা সৎ।

৭. ভাইয়ের পুত্র।

৮. বোনের পুত্র।

৯. তাদের আপন নারীকুল। চাই আত্মীয়তার দিক থেকে আপন হোক কিংবা দীনি দিক থেকে। বেপর্দা অসৎ চরিত্রের নারী, পুরুষ ভাবাপন্ন নারী এবং অমুসলিম নারীদের সম্মুখে পূর্ণ পর্দা করতে হবে।

১০. ক্রীতদাসী।

১১. অধীন ও প্রয়োজনহীন পুরুষ। কারণ, তারা একেতো অধীন থাকার কারণে কোনো প্রকার কুধারণার চিন্তাই করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, তারা যৌন প্রয়োজনহীন। এটা শারীরিক অক্ষমতার কারণেও হতে পারে কিংবা নির্বোধ হবার কারণেও হতে পারে।

১২. সেসব কিশোর যারা এখনো নারীর গোপন অংগ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।

কুরআনে চাচা ও মামার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এর ব্যাখ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চাচা পিতারই সমতুল্য।' সুতরাং চাচা ও মামার ব্যাপারেও তাই। এদের সম্মুখেও সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে।

ট. গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের কথা

গায়রে মাহরাম পুরুষদের সম্মুখে নারীদের পূর্ণ পর্দা করতে হবে। গায়রে মাহরাম মানে যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম নয়। এদের সম্মুখে কিছুতেই নিজেদের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবেনা। তারাও গায়রে মাহরাম নারীদের নিকট প্রবেশ করবেনা, তারা যতোই নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্তমান মুসলিম সমাজে যারা গতানুগতিক পর্দা করেন, তারাও অনেকেই নিকটাত্মীয়দের থেকে পর্দা করেননা। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান অনুযায়ী একজন মহিলাকে স্বামীর ভাই, ভগ্নিপতি, চাচাতো ও খালাতো ভাই এবং নিজের চাচাতো খালাতো ভাইদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। আর এ পুরুষদেরকেও তাদের ভ্রাতৃবধু এবং এ পর্যায়ের বোনদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। যদি তাদের কেউ এ বিধান লংঘন করেন, তবে তিনি আল্লাহ ও রসূলের ফরয করা বিধানকে লংঘন করলেন। এরূপ কোনো নিকটাত্মীয়কে যদি তার এরূপ কোনো নিকটাত্মীয়ার কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সে ব্যাপারে আল্লাহর বিধান হচ্ছে ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔

"তাদের নিকট যদি তোমরা কোনো জিনিস চাও, তবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমরা অবশ্যি নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।" একথা শুনে একজন আনসার সাহাবী উঠে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ওগো আল্লাহর রসূল! স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে আপনি কি বলেন?" তিনি বললেন ঃ "স্বামীর নিকটাত্মীয়রাতো মৃত্যু সমতুল্য।" (বুখারী, মুসলিম)

এখানে নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই ও ভগ্নিপতিদের বুঝানো হয়েছে। এরা স্ত্রীর দেবর বা ভাসুর হয়ে থাকে। এদের সাথে মেলামেশা সবচাইতে বিপদজনক। ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যারা আল্লাহর পথের বীর ও বীরাংগনা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই যাদের জীবনোদ্দেশ্য, হাজারো পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত পর্দার বিধান মেনে চলা। এটাই তাদের জন্যে কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

ঠ. ইসলামের নিকাব বিধান

১. নিকাব সমস্যা

যে বস্ত্র দিয়ে মহিলাদের শরীর ঢেকে রাখা হয় তাকে বলা হয় 'হিজাব' বা পর্দা। এই হিজাবেরই একটি অংশ হলো 'নিকাব'। নিকাব মানে সেই বস্ত্র বা বস্ত্রাংশ যা দিয় মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মুসলিম মহিলাদের মুখমণ্ডলের ব্যাপারে হিজাব বা পর্দার বিধান কি? তারা কি নিকাব পরিধান করবে? নাকি মুখমণ্ডল উন্মুক্ত অনাবৃত রাখা তাদের জন্য বৈধ? কিছু সংখ্যক আলেম মনে করেছেন, মুসলিম মহিলাদের মুখাবয়ব খোলা রাখার অবকাশ আছে। অন্যরা মনে করেন কুরআন সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী মুসলিম মহিলাদের জন্যে তাদের শরীরের অন্যান্য অংশ ঢেকে রাখার মতোই মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কুরআন মজীদের একটি আয়াতাংশের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের কিছুটা মতপার্থক্যই সমস্যাটির মূল কারণ ঃ সে আয়াতাংশটি হলো ঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔(النور: ٣١)

"আর তারা (নারীরা) যেনো নিজেদের 'যীনত' (সৌন্দর্য) প্রকাশ না করে।

'তবে যা স্বতই প্রকাশ হয়ে পড়ে' তার কথা স্বতন্ত্র।"

'তবে স্বঃতই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে' বাক্যাংশের বিশ্লেষণে কেউ কেউ মুখমণ্ডলকেও এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য বলে মনে করেছেন।

এখন এ বিষয়টির উপরই আমরা এখানে একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন পেশ করবো। যাতে করে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক শরয়ী দৃষ্টিকোণ সকলের নিকট স্পষ্ট হয়।

২. পর্দার উদ্দেশ্য

ইসলাম যিনা হারাম করেছে। এটাকে অশ্লীল ও নিকৃষ্টতম নোংরা অপকর্ম বলে অভিহিত করেছে। এবং যিনার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে। মুসলিম নর নারীকে এই যিনা এবং যিনার নিকটবর্তী হওয়া থেকে দূরে রাখাই হিজাব বা পর্দা সংক্রান্ত শরয়ী বিধানের উদ্দেশ্য। এই বিধান সমাজকে যাবতীয় ফিতনা এবং নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ রাখার গ্যারান্টি। তা ছাড়া ইসলাম লজ্জা শরমকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছে। এ লজ্জা সংরক্ষণও পর্দা বিধানের একটি উদ্দেশ্য।

৩. নারীদেহে মুখমণ্ডলের গুরুত্ব

নারীর মুখাবয়বই তার সৌন্দর্যের প্রতীক। সর্বকালের সর্বসাধারণ মানুষ নারীর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখেই তাকে সুন্দরী বলে অভিহিত করে আসছে। বিয়ের ক্ষেত্রেও মূলত এই মুখাবয়ব দেখেই পুরুষ নারীকে পছন্দ করে থাকে। এমনকি পথে ঘাটে যখন নারীর প্রতি পুরুষের চোখ পড়ে, তখন তার মুখমণ্ডলের প্রতিই পড়ে থাকে। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন সামাজিক জীবনে মেয়েদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে। তাদের মতে, এটা যুক্তিসঙ্গতও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত বিধানও নয়। তাই পর্দা বিধানে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা না রাখার উভয় ধরনের মত খতিয়ে দেখা দরকার।

৪. 'যীনত' শব্দের অর্থ

মুখাবয়ব খোলা রাখা যায় বলে অনুমান করা হচ্ছে যে আয়াতাংশ থেকে তাতে 'যীনত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "নারীরা যেনো তাদের যীনত প্রকাশ না করে। তবে যা স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।" অর্থাৎ যে যীনত স্বঃতই প্রকাশ পয়ে পড়ে তাতে বাধা নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারীর যীনত বলতে কি বুঝায়? আল্লামা ইবনে কাসীর, আল্লামা সাবুনী প্রমুখ মুফাসসিরগণ লিখেছেন ঃ নারীর যীনত মানে ঃ

مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ -

সেইসব জিনিস যা নারীকে সৌন্দর্য দান করে।[১]

ইমাম কুরতবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ যীনত দুই প্রকার। এক ঃ প্রাকৃতিক বা সৃষ্টিগত। দুই ঃ কৃত্রিম যীনত। মুখমণ্ডল হলো নারীর সৃষ্টিগত যীনত। আর নারীর কৃত্রিম সৌন্দর্য হচ্ছে তার অলংকার, পোষাক পরিচ্ছদ, খেজাব মেহেন্দী, সুরমা ও অন্যান্য প্রসাধনী দ্রব্য। [২]

৫. আলোচ্য আয়াতে কোন্ ধরনের যীনতকে প্রকাশযোগ্য বলা হয়েছে? মতান্তরের সূত্রপাত হয়েছে এখান থেকেই। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তবে যা (যে যীনত) স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এখানে 'যা' শব্দটি বিশেষ নয়, নির্বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে এখানে একটি নির্দিষ্ট অর্থ করা প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট অর্থ করতে গিয়ে ইমাম ও মুফাসসিরগণের মতামতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মতামত মোটামুটি তিন প্রকার। তা হচ্ছে যা স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়ে মানে–

১. মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়।

২. সুরমা, আংটি, অলংকারাদি, খেজাব, মেহেন্দী ইত্যাদি।

৩. সেইসব আচ্ছাদন ও বস্ত্র যা দিয়ে মেয়েরা শরীর ঢেকে রাখে। যেমন ঃ চাদর, বোরকা ইত্যাদি।

৬. কার কি মত?

স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য যে কি? সে বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী, এবং পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে মতামতের পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

যারা মনে করেন এর অর্থ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়, তারা হলেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুজাহিদ, আতা, দাহাক সায়ীদ বিন জুবায়ের, আওযায়ী, ইমাম মালিক এবং হানাফী মাযহাবের কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম। এরা মনে করেছেন, স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়। কিন্তু তাঁদের মতে কংকন পরা হাত এবং অলংকার, সুরমা বা প্রসাধনী পরা মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতে এর অর্থ মুখমণ্ডল নয়। বরঞ্চ এর অর্থ হস্তদ্বয়, কংকন, আংটি ইত্যাদি। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবও

---

১. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী ঃ তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪।

২. আল-কুরতবী ঃ পৃঃ ২২১ ।

মুখমণ্ডলকে প্রকাশযোগ্য মনে করেননা। মিসওয়ার বিন মাখরামা এবং কাতাদাহ ও মনে করেন অলংকারসহ হাত খোলা রাখা যায় বটে, কিন্তু মুখমণ্ডল খোলা রাখা যায়না। তবে চক্ষুদ্বয় বা একটি চক্ষু খোলা রাখা যেতে পারে।

অপর একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৩]

এদিকে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণের মধ্যে একদল বিরাট সংখ্যক লোক মনে করেন, স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্যের অর্থ নারীর মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় বা তাদের অভ্যন্তরীণ অলংকারাদি নয়। বরঞ্চ এর অর্থ নারীদের সেই বস্ত্র বা আচ্ছাদন, যা দিয়ে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ সাজ ও সৌন্দর্য ঢেকে রাখে বা পর্দা করে। তাদের মতে নারীর অভ্যন্তরীণ সাজ সৌন্দর্য ঢেকে রাখার আচ্ছাদন বা বস্ত্রের মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আছে। আর এ সৌন্দর্যই স্বঃত ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত থাকে। স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্য বলতে কুরআন পাকে এ সৌন্দর্যের কথাই বলা হয়েছে। তাঁরা বলেন ঃ আয়াতে সৌন্দর্য "প্রকাশ করার" কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সে সৌন্দর্যের কথা যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।' সুতরাং প্রকাশটা ইচ্ছাকৃত নয়, অনিচ্ছাকৃত। তাদের মতে এ অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ হয়ে পড়া সৌন্দর্যের মধ্যে আরো রয়েছে ঃ বাধ্য হয়ে চিকিৎসককে যদি শরীরের কোনো অংগ দেখাতে হয়– তা। সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে বাধ্য হয়ে শরীরের কোনো অংগ দেখাতে হলে– তা এবং বাতাসের ঝাপটায় বা অন্য কোনো অনিচ্ছাকৃত কারণে হঠাৎ করে শরীরের কোনো অংশের আচ্ছাদন বা বস্ত্র পড়ে যাওয়ার ফলে যতোটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে– তা।

এ মত যাদের, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইমাম ইব্রাহীম নখয়ী, হাসান বসরী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রমুখ।

৭. মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে যুক্তি

প্রাচীন ইমাম ও আলেমগণের মধ্যে যারা উপরোক্ত আয়াত মুসলিম নারীকে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সম্মুখে মুখাবয়ব খোলা রাখার অবকাশ দিয়েছে বলে মনে করেন, তাঁরা তাদের মতের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি পেশ করেন ঃ

ক. কয়েকজন সাহাবী ও তাবেয়ী "তবে যা স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়ে" বাক্যাংশের অর্থ করেছেন মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়।

---

৩. সূরা আহযাবের ৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি এ মত প্রকাশ করেছেন। দ্রষ্টব্য ঃ
(১) তাফসীরে ইবনে জরীর তাবারী (২) তাফসীরে জালালাইন ২য় খণ্ড।

খ. হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিও তাঁরা তাদের মতের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে পেশ করেন ঃ

"একবার আবু বকরের কন্যা আসমা খুব পাতলা কাপড় পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ঃ 'আসমা! মেয়েরা যখন বালেগ হয়, তখন তাদের শরীরের কোনো অংগ দেখা যাওয়া বৈধ নয়! তবে এই এই অংগের কথা আলাদা।' একথা বলে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয়ের প্রতি ইংগিত করেন।" (আবু দাউদ)

গ. তাঁরা এটাকেও যুক্তি হিসেবে পেশ করেন যে, নামায এবং ইহরাম অবস্থায় মেয়েদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় খোলা বৈধ। সুতরাং এগুলো নারীদের গোপন অংগ নয়। কেননা, গোপন অংগসমূহ ঢেকে রাখাতো তাদের জন্যে ওয়াজিব এবং কোনো গোপন অংগ খোলা রাখলে নামায সহীহ হতে পারেনা।

৮. মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পক্ষে যুক্তি

যাঁরা মনে করেন কোনো অবস্থায়ই মুসলিম নারীর মুখমণ্ডল গায়রে মাহরাম পুরুষদের সম্মুখে খোলা রাখা বৈধ নয়, তাঁদের যুক্তি হলো ঃ

ক. "তারা যেনো তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে" আয়াতাংশ মুসলিম নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মুমিন নারী কিছুতেই তার শরীরের কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারেনা। মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার তো প্রশ্নই উঠেনা। কেননা, নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য তো তার মুখমণ্ডলই। "তবে যা স্বঃতই প্রকাশ হয়ে পড়ে" আয়াতাংশ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে সেই সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে, যা একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ হবে বাতাসের ঝাপটায় আচ্ছাদন সরে গিয়ে আকস্মিক শরীরের কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়লে তা। কিংবা এর অর্থ সেই বস্ত্র যা দিয়ে মেয়েরা শরীর আবৃত বা অচ্ছাদিত করে রাখে। যেমন ঃ বোরকা, চাদর ইত্যাদি। মোটকথা 'প্রকাশ করা' এবং প্রকাশিত হয়ে পড়া এক জিনিস নয়।

খ, বহু সংখ্যক হাদীস একথা প্রমাণ করে যে নারীর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকানো নিষিদ্ধ। যেমন ঃ

"হঠাৎ নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।"[৪]

---

৪. মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ঃ জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

"হে আলী! (নারীর প্রতি) প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করোনা। কেবল প্রথমবার নযর পড়াটাই তোমার জন্যে বৈধ। দ্বিতীয়বার নযর দেয়া বৈধ নয়।"[৫]

"নহরের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সোয়ারীতে ফদল ইবনে আব্বাসকে আরোহণ করিয়েছিলেন। ফদল ছিলেন সুন্দর সুঠামদেহ এবং মনোরম চুলের অধিকারী। অতপর খাসআম গোত্রীয় এক মহিলা নবী পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতোয়া চাইতে আসলে ফদল মহিলাটির প্রতি এবং মহিলাটি ফদলের প্রতি তাকাতে থাকলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফদলের মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন...।"[৬]

গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি তাকানো যে নিষিদ্ধ এ হাদীসগুলো তারই প্রমাণ। আর নারীর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকানো বিশেষভাবে এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

গ. হযরত আয়েশা এবং ফাতিমা বিনতে মানযার থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, ইহরাম অবস্থায়ও পুরুষের সম্মুখীন হলে তাঁরা নিজেদের মুখমণ্ডল আবৃত করে নিতেন। সুতরাং রসূলুল্লাহর যুগের মহিলাগণ মুখমণ্ডল যেনো উন্মুক্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতেন বলে বুঝা যায়।

মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে হযরত আয়েশার সূত্রে আসমা বিনতে আবু বকর-এর যে হাদীসটি পেশ করা হয়, বর্ণনা সূত্রে তা খুবই দুর্বল। হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ আয়েশা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনে দুরাইক। অথচ এই খালিদ হযরত আয়েশার সাক্ষাত লাভ করেননি। অপরদিকে হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী সায়াদ ইবনে বশীর আবু আবদুর রহমান আল বসরীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অনেকেই আপত্তি করেছেন।[৭]

ইহরাম ও নামায অবস্থায় মুসলিম মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারার অনুমতিকে যারা গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনেও খোলা রাখতে পারার যুক্তি হিসেবে পেশ করেন, তাদের সে যুক্তি নিতান্তই ভুল। বস্তুত ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারার অনুমতিই এ কথার প্রমাণ যে, অন্য

---

৫. মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ঃ আলী রাদিয়াল্লহু আনহু।

৬. বুখারী, মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৭. মুখতাসার সুনানে আবু দাউদ।

সময় তারা মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারবেনা। তাছাড়া ইহরামের সময় মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার বাস্তবসম্মত যুক্তিও রয়েছে।[৮] আর নামাযে মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারার যুক্তি হচ্ছে এই যে, নামায তাদেরকে নির্জ্জনতম স্থানে পড়তে বলা হয়েছে। তা ছাড়া মাহরাম পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখার অবকাশ তাদের দেয়া হয়েছে।[৯] ইমাম ইবনে জুযী বলেছেন ঃ নামাযে মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হলে এটা তাদের জন্যে খুবই কঠিন কাজ হতো।[১০]

উপরোক্ত আয়াতে মুসলিম মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার অবকাশ আছে বলে সম্মানিত যে দুয়েকজন সাহাবী মনে করেছেন, তা নিতান্তই তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদ।

৯. অপর দু'টি আয়াতের ভাষা

ইমাম ও মুজতাহিদগণের মধ্যে যারা গায়রে মাহরাম পুরুষদের সম্মুখে মুসলিম মহিলাদের মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখাকে হারাম মনে করেন, তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে কুরআনের দুটি আয়াতকেও দলিল হিসেবে পেশ করেন। তন্মধ্যে একটি আয়াত হলো ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۔ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔

(الاحزاب : ٥٩)

"হে নবী ! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেনো নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম নিয়মরীতি। যেনো তাদেরকে চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম মহিলাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, কোনো প্রয়োজনে যখন তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়, তখন যেনো তারা মাথার উপর থেকে চাদরের আঁচল

---

৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ পর্দা ও ইসলাম। আব্বাস আলী খান অনূদিত, মুদ্রণ ডিসেম্বর-১৯৮৪, পৃঃ ২৬০।

৯. সূরা আন-নূর ঃ আয়াত-৩১।

১০. তফসীরে ইবনে জুযী ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ ৩১ পৃষ্ঠা।

ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়। তবে একটি চোখ খোলা রাখা যাবে।"[১১]

সকল মুফাসসির এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তার মর্ম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীরেরই অনুরূপ।[১২]

অপর যে আয়াতটি তাঁরা দলিল হিসেবে পেশ করেন, তা হলো সূরা আল আহ্যাবের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াত ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ-

(الاحزاب : ٥٣)

"তোমরা যখন তাদের নিকট থেকে কিছু চাইবে, তা চাইবে পর্দার আড়াল থেকে।"

এক্ষেত্রে ভিন্নমতের আলিমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তো উপর থেকে চাদর বা ওড়না ঝুলিয়ে দিতে বলেছেন, মুখমণ্ডল ঢাকতে বলেননি। আর উপর থেকে চাদর বা ওড়না ঝুলিয়ে দিলে মুখমণ্ডল ঢেকে যায়না, এতে মাথা এবং কর্ণদ্বয় ঢাকা যায়।

আয়াতটি যদিও নবীর স্ত্রীগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম সকল মুসলিম নারীর জন্যে প্রযোজ্য। কেননা মুসলিম নারীদের জন্যে তাঁরাই আদর্শ ও অনুসরণীয়। সুতরাং এ আয়াত প্রমাণ করে যে নারীর গোটা শরীরই "আওরত' বা গোপনীয়।[১৩]

কিন্তু এক্ষেত্রে ভিন্নমতের আলিমগণের বক্তব্য হলো এ আয়াত রসূলের স্ত্রীগণের জন্যে নির্দিষ্ট। অন্যদের জন্যে প্রযোজ্য নয়।

১০. শেষ কথা ঃ

আলোচনা থেকে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা বা উন্মুক্ত রাখা কোনোটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত প্রতিষ্ঠা করা যায়না। কারণ কুরআন ও সুন্নাতে রসূলে এ ব্যাপারে

---

১১. তাফসীরে ইবনে জরীর ও তাফসীরে জালালাইন ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১২. দ্রষ্টব্য ঃ ক. আহকামুল কুরআন ঃ আল্লামা আবু বকর জাস্সাস খ. তাফসীরে কবীর ঃ ইমাম রাযী গ. তাফসীরে ইবনে জরীর তাবারী ঘ. তাফসীরে বায়দাবী ঃ কাযী বায়দাবী ঙ. তাফসীরে ইবনে কাসীর চ. গারায়েবুল কুরআন ঃ আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী ছ. তাফসীরে কাশশাফ ঃ আল্লামা যমখশরী জ. তাফহীমুল কুরআন ঃ আল্লামা মওদূদী।

১৩. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী ঃ তাফসীর আয়াতিল আহকাম ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬।

অকাট্য কোনো নির্দেশ নেই। আলিমগণের মত উভয় দিকেই রয়েছে। যারা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এ পন্থাকেই কল্যাণকর মনে করেছেন। আর যারা মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখার অবকাশ আছে বলে মনে করেন, তারা যুক্তি ও বাস্তবতাকে সামনে রেখেছেন। মূলত উভয় মতের লোকেরাই নিষ্ঠার সাথে মত দিয়েছেন। সুতরাং এটি একটি ফিক্‌হী মতভেদপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে কোনো একটি মতকে অলংঘনীয় মনে করা ঠিক নয়।

আট ঃ ইসলামী পরিবারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. আত্মীয় স্বজনের অধিকার

ইসলামী পরিবারের সদস্যদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আত্মীয়স্বজনের অধিকার আদায় করা। কুরআন মজীদে পিতামাতার পরই নিকটাত্মীয়দের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

আত্মীয়দের অধিকার বলতে বুঝায় তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, ভালো ব্যবহার করা, খোঁজ খবর নেয়া, যারা দরিদ্র তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের মেহমানদারী করা, পরিচর্যা করা, তাদের কোনো প্রকার হক নষ্ট না করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা ইত্যাদি।

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে তাদের এসব অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ওয়াজিব করে দিয়েছে। সুতরাং আত্মীয়স্বজনের এসব অধিকার রক্ষায় ইসলামী পরিবারকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

আত্মীয়দের অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতিই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে যথেষ্ট মনে করছি।

সকল নবীর উম্মতদের প্রতিই নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ ছিলো ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ ـ(البقرة : ٨٣)

"বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে আমরা পাকা পোখ্‌ত ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামী করবেনা, ভালো ব্যবহার করবে পিতামাতার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে...।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৩)

পুণ্যের দিক থেকে ঈমানের পরই নিকটাত্মীয়দের দান করার মর্যাদা উল্লেখ হয়েছে ঃ

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى ـ (البقرة : ١٧٧)

"বরঞ্চ প্রকৃত পুণ্যের কাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকালকে, ফেরেশতাদেরকে, আল কিতাবকে ও নবীদেরকে (আন্তরিকতার সাথে) মান্য করবে আর আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন সম্পদ দান করবে নিকটাত্মীয়দের... ।" (সূরা বাকারা ঃ ১১৭)

সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করানো আর ভালো ব্যবহার করো বাবা মার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

সূরা আন্ নহলে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى ـ

"আল্লাহ তা'আলা সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন।" (আয়াত ঃ ৯০)

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ ـ

"নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান করো।" (আয়াত ঃ ২৬)

সূরা নিসায় আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে পরস্পরের নিকট নিজেদের হক দাবী করো আর নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ককেও ভয় করো। (আয়াত ঃ ১)

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ

"রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।" (বুখারী)

তিনি আরো বলেছেন ঃ "রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলে থেকে বলে ঃ যে আমাকে রক্ষা করলো আল্লাহও তাকে রক্ষা করবেন আর যে আমাকে ছিন্ন করলো আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

খ. উত্তরাধিকার

মৃত লোকদের অর্থ সম্পত্তিতে সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। এ অধিকারকে বলা হয় উত্তরাধিকার। উত্তরাধিকার প্রদান করাকে আল্লাহ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন। পুরুষ ও মেয়ে সকলেই উত্তরাধিকার লাভ করবে। আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ـ (النساء : ٧)

"পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে, নারীদের জন্যেও পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে, চাই তা কম হোক কিংবা বেশি। এ অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয।" (সূরা নিসা ঃ ৭)

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজ হাজারো মুসলিম পরিবারে আল্লাহর নির্ধারিত মীরাসী আইন কার্যকর নেই। মুসলমান সমাজই আল্লাহর এ আইনের ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যাচ্ছে। মৃত ব্যক্তির কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা তো এখন একটা রসমে পরিণত হয়েছে। এ যেনো আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিমদের উত্তরাধিকার আইন আমরা মেনে চলছি। তাদের প্রভাব মুসলমান পরিবারগুলোতে এমনভাবে পড়েছে যে, ভায়েরা বোনদের অংশ বন্টন করে দেয়ার কথা প্রয়োজনও মনে করেনা আর বোনেরাও বাপের সম্পত্তির অংশ নেয়াটাকে একটা খারাপ কাজ মনে করে। এমনকি অনেক মুসলমান পরিবারে বোনদের অংশ দেয়া নেয়াটাকে একটি ঘৃণিত নিকৃষ্ট কাজ মনে করে। প্রায়ই দেখা যায় পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্ররা নিজেদের মধ্যে তার সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। বোনদের অংশ বন্টন করে পৃথক করেনা। এটা বোনদের প্রতি এক যুলুম। পিতার মৃত্যুর পর পিতার সম্পত্তি থেকে নিজেদের অংশ বন্টন করে না নেয়া মেয়েদের জন্যে এক বিরাট অজ্ঞতা। তারা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান না জানার ফলেই এমনটি করে। এমনটি করা আল্লাহর আইন অমান্য করার শামিল। মেয়েদেরকে অবশ্যি নিজেদের অংশ বন্টন করে নিতে হবে। আর পুরুষরা কোনো অবস্থাতেই মেয়েদের অংশ বন্টন করে না দিয়ে নিজেদের অধিকার রাখতে পারবেনা। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা মওদূদী (রঃ) লিখেছেন ঃ

"এ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে দুটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, মীরাস

শুধুমাত্র পুরুষের প্রাপ্য নয়, মহিলারাও এর হকদার হবে। দুই, মীরাস অবিশ্য বন্টন হতে হবে, তার পরিমাণ যতোই কম হোক না কেনো। এমনকি মৃত ব্যক্তি এক গজ কাপড় রেখে গেলেও এবং তার দশজন উত্তরাধিকারী থাকলেও উক্ত কাপড়কে দশখণ্ডে বিভক্ত করতে হবে। অবশ্য একজন ওয়ারিশ আরেকজন ওয়ারিশ থেকে তার অংশ ক্রয় করে নিতে পারে। এ আয়াত থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মীরাসী আইন স্থাবর অস্থাবর, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সকল প্রকার ধন সম্পত্তির উপর কার্যকর হবে।"[১]

মীরাসে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশ ধার্য করে দেয়ার সাথে সাথে কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা যারা তাঁর নির্ধারিত এ বিধান মেনে চলবে তাদের শুভ পরিণাম আর যারা তা অমান্য করবে তাদের অশুভ পরিণামের ফায়সালা করে দিচ্ছেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

"(উপরে মীরাস বন্টনে যার যে অংশ ধার্য করা হলো) তা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত আইন। যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্ধারিত আইন মেনে নেবে, তাকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে আর এ জান্নাতে সে চিরদিন থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে আর তাঁর নির্ধারিত আইনসমূহ লংঘন করবে, তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে আর তার জন্যে রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" (সূরা নিসা ঃ ১৩-১৪)

সুতরাং প্রতিটি ইসলামী পরিবারের সদস্যদেরকে মীরাসী আইন মেনে চলা উচিত। আল্লাহর কঠিন শাস্তিকে ভয় করা উচিত। কোনো নারী যদি মীরাস নিতে অপমান বোধ করেন, কোনো পুরুষ যদি নারীদেরকে মীরাস দেওয়া নেওয়া অপমানজনক কাজ মনে করেন তবে এ আয়াতে আল্লাহ তাকে এর চাইতেও অপমান ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, টীকা ঃ ১২।

আপনারা পরকালের লাঞ্ছনাকর আযাবকে ভয় করুন। প্রতিটি ইসলামী পরিবারে আল্লাহ প্রদত্ত মীরাসী আইন প্রতিষ্ঠা করুন। কোনো মৃত্যুপথের যাত্রীই নিজের কোনো ওয়ারিশকে ঠকিয়ে বা বঞ্চিত করে যেতে চেষ্টা করবেননা। কোনো ঈমানদার মুসলমানই অপরের হক নষ্ট করবেননা। আজই হকদারের হক ফেরত দিন। আল্লাহর কঠিন আযাবকে ভয় করুন। আপনার বোন, ভাগ্নে ও ফুফুদের সম্পত্তি নিজের অধিকারে রাখবেননা। এটা জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন। এ জন্যে চরম অপমানজনক শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে। কোনো মহিলা তার অধিকারের মর্যাদা বুঝতে না পারলে তাকে বুঝিয়ে দিন। তার হক তার হাতে অর্পণ করুন। আপনি যদি নারী হয়ে থাকেন তবে আপনার পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে তার যাবতীয় সম্পত্তি বন্টন করে আপনার অংশ আপনি গ্রহণ করুন। এটা আপনার আল্লাহ প্রদত্ত অংশ। আপনার গলার হার যেমন আপনার। আপনার ব্যাংকে জমা করা টাকা যেমন আপনার, আপনার আলমারীর জিনিসপত্র যেমন আপনার, ঠিক তেমনি আপনার মীরাসী অংশও আপনার। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন। আপনার অংশ আপনি গ্রহণ করুন।

গ. চাকর চাকরাণীর অধিকার

ইসলাম চাকর চাকরাণীদের অধিকারের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। আমাদের শহরে বন্দরে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই দুয়েকজন গৃহ পরিচারক বা পরিচারিকা রয়েছে। ইসলামী পরিবারের এক বিরাট দায়িত্ব হচ্ছে এদের প্রতি সদাচর ও সুবিচার করা। এরা মুসলমান হিসাবে আমাদের দীনি ভাই বা বোন। তাই এদের প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের দীনি কর্তব্য। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমাদের চাকর চাকরাণী ও দাসদাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই ও বোন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার যার ভাই (বা বোনকে) তার অধীন করে দিয়েছেন, সে যেনো ওদের তা-ই খেতে দেয়, যা সে নিজে খায়। তা-ই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার উপর চাপানো না হয়। একান্ত যদি চাপানো হয়ই তবে যেনো তা সমাধা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা হয়।" (আবুযর ঃ বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"যখন তোমাদের চাকর চাকরাণী তোমাদের জন্যে খানা তৈরী করে এনে হাযির করে, তখন নিজেদের সাথে বসিয়ে তাকে খাওয়াবে। কেননা সে ধুঁয়া ও

তাপ সহ্য করেছে। আর (কোনো) খানা যদি পরিমাণে কম হয় তবে অন্তত দুএক মুষ্টি তার হাতে দেবে।" (মুসলিম)

হাদীস দুটি থেকে আমরা চাকর চাকরাণীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশিকাগুলো পেলাম ঃ

১. চাকর চাকরাণীদের মর্যাদা হচ্ছে দীনি ভাই বা বোনের মর্যাদা।

২. পরিবারের সদস্যরা যা খাবেন তাদেরও তা-ই খাওয়াবেন।।

৩. পরিবারের সদস্যরা যে ধরনের পোষাক পরিধান করেন, তাদেরও সে ধরনের পোষাক পরাবেন।

৪. সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ তাদের উপর চাপানো যাবেনা।

৫. কোনো কঠিন কাজ করতে দিলে তাতে তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

৬. নিজেদের সাথে একত্রে বসিয়ে তাদের খাওয়াতে হবে।

প্রতিটি ইসলামী পরিবারের দায়িত্ব হচ্ছে চাকর চাকরাণীদের ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার প্রদান করা। এ ব্যাপারে ইসলামী পরিবারগুলোর আদর্শ ভূমিকা পালন করা উচিত।

ঘ. প্রতিবেশীর অধিকার

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। এক মুসলমান প্রতিবেশীর উপর অন্য প্রতিবেশীর বহুবিধ অধিকার রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা অনুযায়ী এসব অধিকার রক্ষা করা না করার উপর ঈমানের যথার্থতা নির্ভর করে। তাই প্রতিটি ইসলামী পরিবারকে তাদের প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। এখানে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এ বাণীগুলো অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন ইসলামে প্রতিবেশীদের অধিকার রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্কের আসমানী তাকীদ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জিব্রীল আমাকে সবসময় প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্যে তাকীদ করতেন। এতে আমার ধারণা হচ্ছিল, হয়তো বুঝি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

২. ঈমানের সম্পর্ক

"আল্লাহর শপথ, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই! আল্লাহর শপথ ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়! আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি ঈমান রাখেনা! জিজ্ঞাসা করা হলো, ওগো আল্লাহর রসূল! কে সে ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকেনা।" (আবু হুরাইরা ঃ বুখারী, মুসলিম)

"যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে মুমিন নয়।" (ইবনে আব্বাস ঃ মিশকাত)

৩. নিজের ভালো মন্দ জানার মাপকাঠি

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস কলো ঃ ওগো আল্লাহর রসূল! আমি ভালো করছি না মন্দ করছি তা আমি কি করে জানবো? তিনি বললেন ঃ যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে তুমি ভালো করছো, তবে তুমি প্রকৃতই ভালো করছো। আর যখন প্রতিবেশীরা বলবে তুমি মন্দ করছো তবে তুমি সত্যি মন্দ করছো।" (ইবনে মাসউদ ঃ ইবনে মাজাহ)

৪. হাদীয়া পাঠানো উচিত

"যখন তুমি সুরুয়া (যে কোনো ধরনের মাছ, গোশত বা তরি-তরকারী) পাকাবে তাতে একটু বেশী পানি ঢেলে দিও এবং প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিও।" (আবু যর ঃ মুসলিম)

"হে মুসলিম নারীরা! প্রতিবেশীর কোনো হাদীয়াকে তুচ্ছ মনে করোনা তা যদি বকরীর একটা পায়াও হয়।" (আবু হুরাইরা ঃ বুখারী, মুসলিম)।

৫. নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, আমি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। হাদীয়া পাঠানোর ব্যাপারে তাদের কাকে আমি অগ্রাধিকার দেবো? তিনি বললেন ঃ যার ঘর তোমার ঘরের বেশী নিকটে। (বুখারী)।

প্রতিবেশী বলতে বুঝায় পাড়া প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্রের সঙ্গী সহযোগী ও আশ পাশের লোকদের। এমন কি ভ্রমণসঙ্গীও এক প্রকার প্রতিবেশী।

ঙ. মেহমানের অধিকার

ইসলামী পরিবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কাজের মধ্যে মেহমানদারী অন্যতম। মেহমানের সম্মান যত্ন করা ঈমানের দাবী। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেনো তার মেহমানের সম্মান যত্ন করে।" (আদাবুল মুফরাদ)

এক মুসলমান ভায়ের ঘরে আরেক মুসলমান ভায়ের মেহমান হবার অধিকার রয়েছে। মেহমানদারী করতে হবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। সাধারণত মেহমান হয়ে থাকেন আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, মুসাফির এবং অভাবের তাড়নায় প্রার্থী লোকেরা।

লোকদেরকে খানার দাওয়াত দিয়ে মেহমানদারী করা খুবই সওয়াবের কাজ।

নয়ঃ ইসলামী পরিবারের দীনি যিন্দেগী

ক. আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাঁরই গোলামী ও দাসত্ব করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি মানুষকে দিয়েছেন ইচ্ছাশক্তি ও চলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। আর মানুষের সামনে রয়েছে দুটি চলার পথ। একটি হলো তার সৃষ্টিকর্তার গোলামীর পথ। এ পথে চলার জন্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অপরটি হলো শয়তানের পথ, খোদাদ্রোহিতার পথ।

এখন মানুষ তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে দুটি পথের যে কোনো একটি পথে চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সে মানুষকে খোদাদ্রোহিতার পথে ঠেলে দেয়ার জন্যে অবিরামভাবে তার পিছে লেগেই আছে। সে মানুষকে চিরতরে অকল্যাণের দিকে ঠেলে দিতে চায়।

কিন্তু মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি খুবই দয়াবান। তিনি মানুষকে তাঁর গোলামী করার জন্যে, যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে সবসময় তাকীদ করে আসছেন। এ উদ্দেশ্যে যুগ যুগ ধরে নবী ও কিতাব পাঠিয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন।

নবীগণ মানুষকে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান করেছেন। বস্তুত এটাই মানুষের চিরন্তন কল্যাণের পথ। এ পথে চললেই সে চির সুখের জান্নাত লাভ করবে। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাই ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ - (الذاريت:٥٦)

"জিন ও মানবকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

যে উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হবার জন্যে তিনি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(البقرة : ٢١)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই মহান রবের গোলামীর পথ অবলম্বন করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগেকার লোকদের সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২১)

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এটাই মানুষের একমাত্র মুক্তি ও কল্যাণের পথ। তাই ইসলামী পরিবারের সদস্যদের জীবনোদ্দেশ্যই হতে হবে আল্লাহর গোলামী করা ও তাঁর পথে চলা। তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ ও পরকালের মুক্তি লাভ। ইসলামী পরিবারের সার্বিক কাজ কর্ম ও চেষ্টা সংগ্রাম এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতে হবে।

খ. দীনি ইল্‌ম চর্চা

আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ইসলামের জ্ঞানার্জন করা ফরয করে দিয়েছেন। বস্তুত ইসলামকে না জানলে সঠিকভাবে ইসলাম অনুযায়ী চলা সম্ভব নয়। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোল্‌না থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো।" গোটা জীবনটাই আসলে জ্ঞানার্জনের সময়। ইসলামী পরিবারের সদস্যদের ঈমান আকীদা, ইবাদত, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের মৌলিক ও যথার্থ জ্ঞান হাসিল করতে হবে। আর ইসলামের এসব মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার।

পরিবারের শিশু কিশোরদেরকে কুরআন, সূরা কিরাত, দোয়া দরূদ এবং নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদতের নিয়ম কানুন পরিবারেই শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। পিতামাতাই সন্তানের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এখান থেকে শিশুরা যে শিক্ষা লাভ করবে সেটাই তাদের মানসপটে চিরদিনের জন্যে খোদাই হয়ে থাকবে। ইসলামী পরিবারের যেমন শিশুদেরকে মৌলিক ইসলামী জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত, তেমনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও প্রতিদিন কিছু ইসলামী জ্ঞানার্জন করা উচিত। সকলের চেষ্টা করা উচিত যেনো কোনো দিনই কুরআন অধ্যয়ন করা বাদ না যায়। প্রতিদিনই প্রত্যেকের কিছু কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআনের কিছু অংশের ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন করা উচিত। কমপক্ষে প্রতিদিন তিনটি আয়াত হলেও ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন করা উচিত। যিনি যতো বেশী অধ্যয়ন করতে পারবেন সেটা তার জন্যে ততোই মঙ্গলজনক। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলায় বহু গ্রন্থ অনূদিত ও রচিত হয়েছে। ইসলামী পরিবারের সদস্যদেরকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা

উচিত। এভাবে গোটা পরিবারকে ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ইসলামী পরিবারে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের একটি ছোট খাটো লাইব্রেরী গড়ে তোলার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রতি মাসে এক দুইখানা করে ক্রয় করলে দুই এক বছরের মধ্যে বইয়ের একটা বিরাট পুঁজি গড়ে উঠবে। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও জ্ঞান চর্চার আগ্রহ জাগ্রত হবে। কুরআনে দীনের জ্ঞানকে 'আলো' বলা হয়েছে। প্রতিটি ইসলামী পরিবারকেই এ আলোতে জোতির্ময় হয়ে উঠা উচিত।

গ. সালাত (নামায) কায়েম

নামায হচ্ছে মুসলমানদের এক নম্বরের ইবাদত। ঈমানের পরই নামাযের স্থান। ঈমান আনার পর কোনো ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমই নামায আদায় করতে হয়। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায।" অর্থাৎ মুসলমান নামায পড়ে আর কাফির নামায পড়েনা। তিনি আরো বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নামায বাদ দিলো সে কুফরী করলো।' এ জন্যেই কুরআনে বার বার বলা হয়েছে ঃ "আকীমুস সালাত নামায কায়েম করো।" মুমিন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "ইউকীমুনাস সালাত" "তারা নামায কায়েম করে।" স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেনো তাঁর পরিবার পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দেন এবং এর উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করেন। "তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও। নামায শিক্ষা দাও আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো। (সূরা তোয়াহা ঃ ১৩২) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া করেন ঃ

"ওগো আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও, আর আমার সন্তানদেরও নামায কায়েমকারী বানাও।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪০)

কুরআন মজীদে নিজ সন্তানদের প্রতি লোকমান হাকীমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। তিনিও সন্তানদের নামায কায়েমের অসীয়ত করেছেন ঃ

"হে আমার সন্তান! নামায কায়েম করবে।" (সূরা লোকমান ঃ ১৭)

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে নিজেকে এবং নিজ পরিবার পরিজনকে নামাযে অভ্যস্ত করে তোলার গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গেছে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উম্মতকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দিয়ে যান। শিশু সন্তানদের কতো বছর বয়স থেকে নামাযে অভ্যস্ত করতে হবে তাও তিনি স্পষ্টভাবে বলে যান ঃ "সাত বছর বয়সে পৌঁছুলেই তোমাদের সন্তান সন্ততিদের

নামাযের আদেশ করো আর তাদের বয়স দশে পৌছুলে নামায পড়ানোর জন্যে তাদের শাসন করো এবং তাদের শয্যা পৃথক পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

এখানে একটা বাস্তব কথা বলতে হয়। তা হচ্ছে এই যে, পিতামাতা যদি ঈমানদার ও নিয়মিত সালাত আদায়কারী হন, তবে শিশুবেলা থেকে তাদের সন্তানরা আপনিতেই নামাযী হয়ে গড়ে উঠবে। সাত বছরের আগেই পিতামাতার দেখা দেখি রাব্বুল আমীনের দরবারে তাদের মাথা সিজদায় অবনত হয়ে যাবে। এভাবে কোনো ঘর নামাযের ঘর ও নামাযের পরিবেশে পরিণত হলে সে ঘরের সদস্যরা এমনিতেই নামাযী হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে নামাযের জন্যে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে।

পুরুষরা নামায পড়বেন মসজিদে। জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের দায়িত্বই পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। একা নামায পড়ার চাইতে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি। কোনো পুরুষ বিনা কারণে জামায়াত ত্যাগ করলে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হতেন এবং তার প্রতি কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেন। তবে ফরয ব্যতিত বাদবাকী নামাজ ঘরে পড়াই মুস্তাহাব।

মেয়েদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেয়েরা ঘরের যতো নির্জন কোণে নামায আদায় করবে, ততোই তাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অবশ্য মহিলা সাহাবীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছে জামায়াতে নামায পড়তে চাইলে তিনি তাদের অনুমতি প্রদান করেন এবং সাথে সাথে উপরোক্ত মন্তব্যও করেন।

কোনো পরিবারের সদস্যরা নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, সে পরিবারে অন্যান্য ইবাদতের চর্চা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

ঘ. অন্যান্য ইবাদত

নামায হচ্ছে সমস্ত ইবাদতের শিরোমনি। নামায কায়েম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কোনো পরিবারকে ইসলামী পরিবার বলা যেতে পারেনা। ইসলামী পরিবারে নামায কায়েমের সাথে সাথে অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতসমূহ অবশ্যি চর্চা হওয়া দরকার। প্রত্যেক ইবাদত তার গুরুত্ব অনুযায়ী পালন করতে হবে। ফরযকে ফরযের গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে হবে। ওয়াজিবকে ওয়াজিবের গুরুত্ব দিতে হবে আর নফলকে দিতে হবে নফলের গুরুত্ব।

নামযের পরই যাকাতের স্থান। বছরের শেষে নিসাব পিরমাণ অর্থসম্পদ থাকলে মুসলমানদের জন্য যাকাত পরিশোধ করা অপরিহার্য– ফরয। ইসলামী পরিবারের নারী পুরুষ সকল সদস্যকেই তার অর্থসম্পদের যাকাত পরিশোধ করা একান্ত কর্তব্য। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, যারা যাকাত পরিশোধ করবেনা, পরকালে তাদের সম্পদ তাদের জন্যে কঠিন আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যাকাত ছাড়াও মুসলমান নারী পুরুষের জন্যে সব সময় দান সদকা করা কর্তব্য। ইসলামে দানের বড়ই মর্যাদা রয়েছে। একটি বীজ থেকে যেমন অগণিত ফল ফসল জন্ম নেয়, তেমনি একটি দানের জন্যও আল্লাহর নিকট রয়েছে অগুণতি প্রতিফল।

রোযাও ইসলামী ইবাদতের একটি মৌলিক স্তম্ভ। রমযান মাসের রোযা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। রমযান মাসে ইসলামী পরিবারে তাকওয়া ও রহমতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। কারণ, পরিবারের সকলেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা রাখেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই পানাহার ত্যাগ করেন এবং কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে যাবতীয় অন্যায় গর্হিত কাজ পরিহার করেন। রোযা রাখার ব্যাপারে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য এবং এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। শিশুদেরকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধীরে ধীরে রোযা রাখায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। রমযান মাসের ফরয রোযা ছাড়াও প্রতি মাসে কিছু কিছু নফল রোযা রাখা মুমিনদের জন্যে খুবই উপকারী।

সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্যে হজ্জ করা ফরয। মালদার হলে নারী পুরুষ সকলকেই হজ্জ করতে হয়। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী হজ্জ নারীদের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য। হজ্জ দ্বারা মুসলমান আল্লাহর জন্যে ত্যাগ ও কোরবানীর প্রমাণ পেশ করে। হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়াও ইবাদতের আরো অনেক পন্থা পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানেরই সেসব জানা এবং মেনে চলা কর্তব্য।

ঙ. পরিবারে ইসলামী আদব আচারের পরিবেশ সৃষ্টি

ইসলামী পরিবারের যাবতীয় কাজ কর্ম ও আচার অনুষ্ঠান ইসলামী আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। পরিবারের সকল সদস্যেরই কর্তব্য হচ্ছে তারা তাদের পূর্ণাংগ জীবনে ইসলামের নমুনা পেশ করবেন। তাদের গোটা নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ যেনো ইসলাম ও মুসলমানের প্রকৃত পরিচয় পায়। তাদের চিন্তা ভাবনা, কথা বার্তা ও আমল আখলাক হতে হবে ইসলামের পূর্ণাংগ

পরিচয়বাহী। তাদেরকে এমন হতে হবে যেনো তাদের আশ পাশের মানুষ এবং তাদের উত্তরসূরীরা তাদের জীবনধারা থেকে ইসলামকে উপলব্ধি করতে পারে। ইসলাম এবং তাদের জীবনধারার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবেনা। এ জন্যে তাদেরকে (ক) এমন সব আমল ও আচরণ পরিহার করতে হবে, যা ইসলাম অপছন্দ করে, (খ) এমন সব আমল ও নৈতিক গুণাবলী তাদের মধ্যে থাকতে হবে যা তাদেরকে আদর্শ মুসলমানে পরিণত করবে। তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এমন সব আচার অনুষ্ঠান ও সভ্যতা সংস্কৃতির লালন করতে হবে যা তাদেরকে অন্য সব মানুষ থেকে পৃথক করে ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে।

১. বর্জনীয় অসৎ গুণাবলী

ইসলামী পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাকে নিম্নোক্ত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার জন্যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য ঃ

১. ফরয ওয়াজিব ইবাদতসমূহে গাফলতি। এ কাজ মানুষকে ইসলামী যিন্দেগী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ২. এমন সব রসম রেওয়াজ ও আচার অনুষ্ঠান পালন করা, যা গুনাহ্, এমনকি শির্কের পর্যায়ে পড়ে। ৩. অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো। ৪. কারো পিছনে তার দোষ চর্চা করা ৫. কারো প্রতি মিথ্যা বা অপবাদ আরোপ করা। ৬. আমানতের খেয়ানত করা। ৭. কারো প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করা। ৮. কাউকে গালাগাল করা। ৯. কারো প্রতি যুলুম ও অন্যায় আচরণ করা। ১০. কাউকে লজ্জা দেয়া। ১১. কাউকে উপহাস করা। ১২. কারো মনোকষ্ট দেয়া। ১৩. ইনসাফ না করা। ১৪. ধোকা দেয়া, প্রতারণা করা। ১৫. কারো ক্ষতি সাধন করা। ১৬. আদান প্রদানে হেরফের করা। ১৭. ওয়াদা ভঙ্গ করা। ১৮. স্বার্থপরতা। ১৯. মিথ্যা কথা বলা। ২০. কুধারণা। এটা একটা মারাত্মক রোগ। ২১. সংকীর্ণতা। ২২. সন্দেহ পরায়ণতা।

এসব অসৎগুণ থেকে নারী, পুরুষ, শিশুসহ সকল মুসলমানকেই দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

২. বরণীয় গুণাবলী

ইসলামী পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাকে নিম্নোক্ত গুণাবলী অর্জন করার জন্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা সাধনা করে যাওয়া উচিত ঃ

১. নিষ্ঠাপূর্ণ বিশুদ্ধ নিয়্যতের অধিকারী হওয়া ২. সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা ৩. দুনিয়ার তুলনায় পরকাল গড়ার কাজে বেশী ব্যস্ত

থাকা ৪. নিজের এবং সকলের কল্যাণ কামনা করা ৫. ইবাদতগুযার হওয়া ৬. সত্যবাদী হওয়া ৭. সুধারণা পোষণ করা ৮. উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া ৯. ক্ষমা করে দেয়া ১০. অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া ১১. ইনসাফ করা ১২. হাসিমুখে কথা বলা ১৩. সকল কাজে আন্তরিকতা ১৪. শোকরগুযার হওয়া ১৫. একে অপরের জন্যে দোয়া করা ১৬. অল্পে তুষ্ট থাকা ১৭. ধৈর্য ধারণ করা ১৮. পরিশ্রমপ্রিয় হওয়া ১৯. দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি ২০. পরস্পরকে ভালোবাসা ২১. সুন্দরভাবে কথা বলা ২২. পরস্পরকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা ২৩. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া ২৪. খোদাভীতির যিন্দেগী যাপন করা।

৩. কতিপয় করণীয় কাজ

ইসলামী আদব ও আচার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ইসলামী পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাকে কতিপয় কাজকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. সকল ভালো কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহর নামে আরম্ভ করা. ২. পরস্পরের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন করা। ঘরে প্রবেশকালে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা, ৩. পিতামাতা ও সকল মুরুব্বীদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও সেবা করা, ৪. ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, ৫. প্রতিটি কাজে ইসলামী আচার ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানো, ৬. নারী পুরুষ সকলকে ইসলামী পর্দা মেনে চলা, ৭. সুখে দুঃখে সব সময় প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ৮. আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা, ৯. মেহমানদারী করা এবং এ ব্যাপারে ধনী দরিদ্রের তারতম্য না করা, ১০. মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ করা, ১১. সকল কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করা।

চ. দীনি পরিবেশ সৃষ্টির উপায়

১. আমাদের সমাজ পরিবেশ

আমাদের সমাজের অবস্থা সকলেরই জানা আছে। আজকে আমরা যে সমাজে বাস করছি, এ হচ্ছে আধুনিক জাহেলী সমাজ। গুটিকয়েক লোকের কথা বাদ দিলে গোটা সমাজ অন্যায়ের স্রোতে ভেসে চলছে। বলতে গেলে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়্যত-পূর্ব যুগে আরবে যে অন্ধকার যুগ বিরাজ করছিল, আমাদের দেশেও সে অন্ধকার যুগ নেমে এসেছে।

যদিও আমাদের দেশে শতকরা নব্বই জন মুসলমান বাস করছে, তারপরও আমাদের এ অধপতন ঘটেছে। আকীদাহ বিশ্বাসের দিক থেকে আজ অনেকেই বিশুদ্ধ ঈমান ও তাওহীদী আকীদাহ বিশ্বাসের সাথে অনেক ভেজালের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শয়তান আমাদের উপর তার রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছে। মানুষ যেন অন্যায়ের বন্যায় ভেসে চলছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে কোনো লোক ইচ্ছা করলেই নির্ঝঞ্ঝাটে অন্যায় কাজ করতে পারে। অন্যায়ের পথে পা বাড়াতে পারে। কিন্তু ন্যায়পথে চলা এখানে বড় কঠিন। দীনি যিন্দেগী যাপন করা বড়ই কষ্টকর। চতুর্দিকে অন্যায় অশ্লীলতার পতাকাবাহী হায়েনার দলের বিষাক্ত ছোবল। এ অবস্থায় দীনি যিন্দেগী যাপন করা কঠিন তো হবেই। এ জন্যেই রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়াটা মুমিনের জন্যে কারাগার স্বরূপ আর কাফিরদের জন্য বেহেশত স্বরূপ।" এখানে জান্নাতের পথ বড় কন্টকাকীর্ণ আর জাহান্নামের পথ বড়ই লোভাতুর। এ লোভ লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত করে কন্টকাকীর্ণ পথে চলার দীপ্ত শপথ নেয়া কয়জনের পক্ষে সম্ভব?

২. খোদার পথে চলার বজ্রকঠিন শপথ নিতে হবে

কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ আর পরকালের নাজাত যাদের জীবনোদ্দেশ্য, তাদেরকে এ পথে চলার বজ্রকঠিন শপথ নিতেই হবে। বিপদসংকুল অথৈ পথ তাদের পাড়ি দিতেই হবে। বাধার জগদ্দল তাদেরকে ডিংগাতেই হবে। কাঁটার বিষাক্ত আঘাত তাদের সইতেই হবে। ঘৃণাভরে পদাঘাত করতে হবে দুনিয়ার সমস্ত লোভ লালসার প্রতি। তবেইতো তারা মুক্তি পাবে আগুনের আযাব থেকে। জাহান্নামের আগুন থেকে তাদের বাঁচতেই হবে। বাঁচাতে হবে পরিবার পরিজন ও সন্তান সন্ততিকে। দয়াময় আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا - (تحريم : ٦)

"নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার পরিজনকে আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।" (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

৩. অবিরাম দাওয়াত ও সংশোধনের কাজ

নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে হলে নিজে আল্লাহর পথে চলতে হবে এবং পরিবার পরিজনকেও আল্লাহর পথে চালাতে হবে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" সুতরাং পরিবারের কর্তাকে তার পরিবার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একইভাবে পরিবারের পরিচালিকাও জিজ্ঞাসিত হবে। একটা মুসলিম পরিবারের যিনি কর্তা হবেন, তার পরিবারের সকল সদস্যকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত করা তার দীনি দায়িত্ব। তিনি এ দায়িত্ব পালন না করলে তাকে আল্লাহর নিকট কঠোর জবাবদিহী করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য হচ্ছে আপন আপন পরিবারকে দীনের পথে চালানোর চেষ্টা করা। এজন্যে প্রতিনিয়ত পরিবার পরিজনকে দীনের তালীম দিতে হবে। যে যে বিষয়ে তাদের বুঝের কমতি আছে, তা তাদের বুঝাতে হবে। দীনি যিন্দেগী যাপন করার জন্যে তাদের সব সময় তাকীদ করে যেতে হবে।

সম্মানের সাথে মুরুব্বীদের এবং স্নেহ মমতার পরশে ছোটদের ভুল ধারণা, ভুল আকীদাহ বিশ্বাস এবং ভুল আমল আখলাক সংশোধন করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সংশোধনের কাজ হবে সব সময় হিকমাত ও কল্যাণ কামনার সাথে। কঠোরতা ও অদূরদর্শীতার মাধ্যমে কাউকেও সংশোধন করতে গিয়ে তাকে দীন থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়াটা হবে বড়ই নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এভাবে দাওয়াত ও সংশোধনের কাজ হবে একটা সার্বক্ষণিক কাজ। এ কাজ থেকে মুহূর্তের জন্যেও গাফিল থাকা যাবেনা।

দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে পরকালীন আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরকালীন মুক্তির দিকে আহবান করতে হবে। কঠিন ও বীভৎস আযাবের চিত্র তুলে ধরতে হবে। কুরআন হাদীসের আলোকে কবর, হাশর ও জাহান্নামের মর্মবিদারক শাস্তির কথা অধিক অধিক আলোচনা করতে হবে। কুরআন হাদীসের আলোকে সীমাহীন নিয়ামতে ভরা জান্নাতের চিত্র তুলে ধরতে হবে। সামগ্রিক দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে এদিকেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে। বস্তুত যার মন মগজে পরকালীন চিন্তা জাগ্রত করে দেয়া যায়, তার অনুভূতিই তাকে দীনের পথে চলতে বাধ্য করে। দোযখের আগুন থেকে বাঁচার তীব্র পেরেশানী এবং জান্নাত লাভের প্রবল আকাঙ্খাই মানুষের আমলকে সহজভাবে সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করে দেয়। এতেই মানুষ পরহেযগারীর জীবন অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

৪. চারিত্রিক আদর্শ স্থাপন

মূলত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দু'ভাবে হয়ে থাকে। এক. মৌখিকভাবে। দুই. বাস্তবভাবে। এতোক্ষণ আমরা মৌখিক দাওয়াতের কথা আলোচনা করেছি। এবার বলতে চাই, আকাঙ্খিত লোকদেরকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাস্তব দাওয়াতের কার্যকারিতার কথা। নিজের চিন্তা চরিত্র, আচার আচরণ, কথা বার্তা, লেন দেন ও আমল আখলাক এসব কিছুকে দীন ইসলামের মাপকাঠিতে গড়ে তোলা এবং কঠোরভাবে এ নীতি মেনে চলাই হচ্ছে বাস্তব দাওয়াত। এভাবে নিজেকে ইসলামী চরিত্রের আদর্শ নমুনা হিসেবে পেশ করার মাধ্যমে অপরকে ইসলামের প্রতি যতোটা আকৃষ্ট করা সম্ভব, কেবল মৌখিক ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে কিছুতেই অতোটা সম্ভব নয়।

পিতামাতা তাদের ইসলামী চরিত্রের দীপ্ত আলোকে সন্তানদের প্রভাবিত করবেন। প্রকৃতিগতভাবেই সন্তানেরা পিতামাতার অনুসরণ করে থাকে। এমনকি পিতামাতা মুশরিক হবার কারণে সন্তানেরা মুশরিক হয়ে যায়। পিতামাতা ইয়াহুদী নাসারা হবার কারণে সন্তানেরাও ইয়াহুদী নাসারা হয়। পিতামাতা মুসলমান হলে সন্তানেরাও মুসলমান হয়। এ এক অকাট্য সত্য ও বাস্তব কথা। সুতরাং পিতামাতা যদি খাঁটি দীনদার পরহেযগার হয়, তাদের যিন্দেগী যদি হয় ইসলামী আদর্শের বাস্তব নমুনা, তাদের চরিত্র ও আমল আখলাক যদি হয় ইসলামের দীপ্ত প্রদীপ, তবে তাদের সন্তানেরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের খাঁটি চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠবে। তাদের যিন্দেগী হবে পিতামাতার ছাঁচে গড়া। এরূপ পিতামাতার সন্তানেরা কোনো ভুলত্রুটি করলেও, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা ভুল করেছে, অন্যায় করেছে। তারা এজন্যে অনুতপ্ত হয়। সন্তানদের সংশোধন করতে এরূপ পিতামাতার তেমন বেগ পেতে হয়না। মোটকথা, পিতামাতার চারিত্রিক আদর্শই সন্তানদের হেদায়াত লাভের বড় উপায়। প্রত্যেক মানুষের জন্যেই চারিত্রিক দৃঢ়তা তার এমন এক হাতিয়ার, যা তার জন্যে সৃষ্টি করে এক সুদৃঢ় প্রভাব বলয়।

খোদা না করুন, কোনো মুসলমান পরিবারের পিতামাতা যদি ইসলামী আদর্শের অনুসারী না হন এবং তাদের সন্তানেরা কিংবা কোনো সন্তান সৌভাগ্যক্রমে ইসলামী আদর্শের অনুসারী হয়ে থাকেন, তবে সে সন্তানকেই গোটা পরিবারের সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি তার চরিত্র ও আমল দ্বারা সকলকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবেন। তিনি ইসলামের যতোটুকু জ্ঞান রাখেন সে অনুযায়ী সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করবেন। তিনি যদি তার কাজে আন্তরিক হন তবে আল্লাহ অবশ্যি তাঁকে সুফল দান করবেন।

৫. পারিবারিক বৈঠক

পরিবারে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির আরেকটি বড় উপায় হলো পারিবারিক বৈঠক। প্রতি সপ্তাহে একদিন যদি পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বসে দীনের চর্চা করা যায়, তবে পরিবারে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হবার ব্যাপারে এটা খুবই সহায়ক।

প্রতি সপ্তাহে পরিবারের সকলকে নিয়ে এরূপ একটি বৈঠক করুন। এজন্যে সুবিধে মতো সপ্তাহের কোনো একটি দিনকে ঠিক করে নিন। প্রতি সপ্তাহে সেই একই দিন সকলকে নিয়ে বৈঠকে মিলিত হোন। ঐদিনকার ঐ সময়ে সকলে নিজেকে অন্য সকল কাজ থেকে মুক্ত রাখুন এবং সপ্তাহে একবার ঐ বৈঠকে মিলিত হবার জন্যে উদগ্রীব থাকুন।

বৈঠকের কর্মসূচী এরূপ রাখা যেতে পারে ঃ

১. যে কোনো একজন বৈঠকের প্রারম্ভে কালামে পাকের একটি ছোট্ট সূরা কিংবা কয়েকটি আয়াত মুখস্থ তেলাওয়াত করবেন।

২. দারসে কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশের ব্যাখ্যা পেশ। এটা যে কোনো একজন করবেন। আগের বৈঠকেই কোনো একজনের উপর দারসে কুরআন পেশ করার দায়িত্ব অর্পণ করে দিতে হবে। তিনি পুরা সপ্তাহ প্রস্তুতি নিয়ে তা বৈঠকে পেশ করবেন।

৩. দারসে হাদীস বা হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করা ঃ যে কোনো একজন একটা বা ২টা হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করবেন। দারসে কুরআনের মতোই আগেই কোনো একজনের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। অবশ্য এক সপ্তাহে দারসে কুরআন এবং পরের সপ্তাহে দারসে হাদীস হতে পারে। অথবা একই বৈঠকে দুটোই হতে পারে।

৪. কোনো একটা নির্দিষ্ট বইয়ের অংশবিশেষ পড়ে শুনানো ঃ এজন্যে ইসলাম এবং ইসলামী শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল সংক্রান্ত যে কোনো একটা ভালো বই বাছাই করে নিতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে তা থেকে কিছু অংশ পাঠ করতে হবে। এভাবে একটা বই শেষ হবার পর আরেকটা বই ধরতে হবে। বৈঠকে একজনের পর একজন করে প্রত্যেকেই কিছু অংশ পাঠ করতে পারেন। পঠিত অংশ কেউ না বুঝলে তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫. আলোচনা ঃ কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা পেশ করা যেতে পারে। আলোচনার বিষয়বস্তু আগেই ঠিক করতে হবে এবং কে আলোচনা করবেন তাও পূর্বের বৈঠকেই নির্ধারণ করতে হবে। পারিবারিক বৈঠকে মাঝে মধ্যে কোনো দীনের সমঝদার ব্যক্তিকে আলোচনা পেশ করার জন্যে দাওয়াত

দেয়া যেতে পারে।

৬. পরামর্শ ঃ পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করলে সে কাজে বরকত হয়। সে কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। সে কাজে ভুল কম হয়। তাই ইসলামী পরিবারের পারিবারিক কাজ কর্ম ও পরামর্শের ভিত্তিতে করা উচিত। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পারিবারিক বৈঠকে সকলের পরামর্শের জন্যে উপস্থাপন করা উচিত এবং সকলে মিলে পরামর্শ করে তা সমাধা করা উচিত। এতে করে সাংসারিক কাজে পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবেনা।

৭. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা ঃ পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা বৈঠকে উপস্থাপন করে তাকে তা শুধরে নেয়ার জন্যে পরামর্শ দেয়া উচিত।

৮. পরবর্তী বৈঠকের কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ পূর্বের বৈঠকেই পরবর্তী বৈঠকের কর্মসূচী তৈরী করে নিতে হবে। আগামী বৈঠকে কে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করবে, কে কি দায়িত্ব পালন করবে এসব কিছু আগেই নির্ধারণ করে নিতে হবে।

এভাবে নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক চালু করতে পারলে আল্লাহর অনুগ্রহে পরিবারে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হতে আর কোনো বাধা থাকবেনা।

৬. দৈনন্দিন কাজের রুটিন

প্রতিটি মুসলমানেরই পরিকল্পিত জীবন যাপন করা উচিত। ইসলামী পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত। যার ব্যক্তিগত জীবনেই কোনো প্রকার শৃঙ্খলা থাকেনা, তাঁর পক্ষে কোনো কাজই সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সমাধা করা সম্ভব নয়। এজন্যে ইসলামী পরিবারের সকল সদস্যেরই দৈনন্দিন কাজ কর্মের রুটিন থাকা উচিত যা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। গোসল, খাওয়া দাওয়া, পড়ালেখা, ঘুম বিশ্রাম, ইবাদত বন্দেগী, কাজ কর্ম ইত্যাদি নিয়মিত বিষয়গুলো সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট কাজ করা উচিত। ইসলামী পরিবারের সকল সদস্যেরই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত।

(ক) সালাত কায়েম ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে পড়া। নিকটবর্তী মসজিদের জামায়াতে শরীক হওয়া উচিত। কাছে মসজিদ না থাকলে পরিবারের সকলে মিলে এবং আশপাশের নামাযীদের ডেকে কোনো এক স্থানে নামায কায়েমের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

(খ) কুরআন অধ্যয়ন

ইসলামী পরিবরের সদস্যদের প্রতিদিনই কুরআন পাকের কিছু অংশ বুঝে পড়া উচিত। এটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়ার দরকার। এজন্যে উত্তম সময় হলো প্রতিদিন বাদ ফজর। কোনো দিন কোনো কারণে এ সময় অধ্যয়ন করার সুযোগ না হলে দিনের অন্য যে কোনো সময় তা পুরা করে দেয়া উচিত।

পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরা যারা এখনো কুরআন পড়া শিখেনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাদের কুরআন শিখানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) হাদীস অধ্যয়ন

দ্বীন ইসলামের মূল উৎস দুটি। একটি হলো কুরআন আর অপরটি সুন্নাহ বা হাদীস। তাই প্রতিটি ইসলামী পরিবারে কুরআনের সাথে সাথে হাদীসেরও চর্চা হওয়া উচিত। প্রত্যেকেই প্রতিদিন অন্তত একটি হাদীস অধ্যয়ন করা উচিত এবং হাদীসটির শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা উচিত। কুরআন অধ্যয়নের পরই হাদীস অধ্যয়নের উপযুক্ত সময়

(ঘ) ইসলামী বই পড়া

ইসলামী পরিবারের যারা পড়ালেখা জানেন, তাদের সকলকেই প্রতিদিন কয়েক পৃষ্ঠা করে ইসলামী বই পড়া উচিত। ইসলামী বই পুস্তক মূলত কুরআন হাদীসেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তাই ইসলামকে বুঝার জন্যে ইসলামী বই পুস্তক পড়া অপরিহার্য। এ জন্যেও সময় নির্ধারিত থাকা উচিত।

(ঙ) দাওয়াতী কাজ

ইসলামী পরিবারের সদস্যদের একটি বড় কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামকে যেভাবে যতোটুকু বুঝেছেন তা তারা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেবেন। অন্যদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করবেন, ইসলামী জীবন যাপনে উৎসাহিত করবেন। নিজ আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবদের দীনের দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কাজ। প্রতিদিনই কিছু সময় এরূপ লোকদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা উচিত।

(চ) আত্ম সমালোচনা

অর্থাৎ নিজের কাজের সমালোচনা করা। প্রতিদিন এশার নামাযের পর কিংবা শোবার সময় এ কাজটি অবশ্য করা উচিত। একান্ত নিরিবিলি আল্লাহ তা'আলাকে উপস্থিত জেনে নিজের সারাদিনের যাবতীয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা করতে হবে। যাবতীয় ভালো কাজের জন্যে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায়

করতে হবে। আর যাবতীয় অন্যায় কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ রহমান ও রহীমের দরবারে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাইতে হবে, ক্ষমা পাওয়ার জন্যে তাঁর দরবারে কান্নাকাটি করতে হবে। ভবিষ্যতে অন্যায় না করার জন্যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ কাজটি নিয়মিতভাবে করতে হবে। আল্লাহর রহমতে এর ফলে প্রত্যেকেরই আমল পরিশুদ্ধ হতে থাকবে।

৭. পরস্পরের জন্যে দোয়া করা

আপন লোকদের হেদায়াতের জন্যে দোয়া একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। ইসলামী পরিবারে সকল সদস্যেরই উচিত আপনজনদের হেদায়াতের জন্যে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করা। পবিত্র কালামে পাকে এরূপ অনেক দোয়ার উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থের পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে আমরা কুরআন মজীদ থেকে কয়েকটি দোয়া উল্লেখ করে দিছি।[১]

(ক) পিতামাতার জন্যে খোদার অনুগ্রহের দোয়া ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

"প্রভু পরওয়ারদিগার! আমার পিতামাতার প্রতি রহম করো। যেমন মায়া মমতা আর স্নেহ বিজড়িত হৃদয়ে তারা ছোট বেলায় আমাকে লালনপালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)।

(খ) নিজের জন্যে, পিতামাতার জন্যে, সন্তানের জন্যে এবং স্বামী স্ত্রীর জন্যে দোয়া ঃ

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ (احقاف : ١٥)

"ওগো পরোয়ারদিগার! আমাকে তাওফীক দাও যেনো আমি তোমার সেসব নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে আর আমার পিতামাতাকে দান করেছো। আর আমি যেনো এমন নেক আমল করি যাতে তুমি খুশী হও। আমার সন্তানদের সালেহ ও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখ শান্তি দাও। তোমারই সমীপে আমি তাওবা করছি আর আমি তোমার অনুগত-মুসলিমদেরই একজন। (সূরা আহকাফ ঃ ১৫)

---

১. এখানে কুরআন ও হাদীসে বর্নিত সবগুলো দোয়া উল্লেখ করার অবকাশ নেই। আল কুরআনের সবগুলো দোয়া জানার জন্যে এই লেখকের 'আল কুরআনের দোয়া' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

"প্রভু আমার! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও। আমার দোয়া কবুল করো। ওগো মালিক! আমাকে, আমার পিতামাতা আর ঈমানদার লোকদের সেদিন মাফ করে দিও, যেদিন হিসাব কার্যকর হবে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪০-৪১)

উপরোক্ত দোয়াটি করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

"ওগো পরওয়ারদিগার! আমাদের জীবন সাথী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দান করো আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম ও পথ প্রদর্শক বানিয়ে দাও।"

(গ) ভাইয়ের জন্যে ভাইয়ের দোয়া ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ (الاعراف: ١٥١)

"পরওয়ারদিগার! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ করে দাও। আর তোমার রহমতের মধ্যে আমাদের দাখিল করো। তুমিই তো সবচে' বড় দয়াবান।" (সূরা আরাফ ঃ ১৪৯)

উল্লেখ্য, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সহদোর ভাই হারুনের জন্যে এ দোয়া করেছিলেন।

(ঘ) সন্তান তথা সৎ সন্তান লাভের জন্যে দোয়া ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ (الصافات: ١٠٠)

"ওগো আমার রব! আমাকে এমন একটি পুত্র দান করো, যে হবে সৎ ও সালেহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।" (আস্ সাফফাত ঃ ১০০)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ـ

"পরওয়ারদিগার, তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো।" (সূরা মরিয়ম ঃ ৫)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

(ال عمران : ٣٧ - ٣٨)

"মালিক আমার! মনিব আমার! তোমার বিশেষ কুদরাতে আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান করো। অবশ্যই তুমি দোয়া শ্রবণকারী।"

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ -

"পরওয়ারদিগার! আমাকে নিঃসন্তান ছেড়োনা। আর তুমিইতো সর্বোত্তম উত্তারাধিকারী।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯)

প্রথম দোয়াটি হচ্ছে নিঃসন্তান হযরত ইব্রাহীমের এবং পরবর্তী তিনটি হচ্ছে নিঃসন্তান হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের। অতপর আল্লাহ তা'আলা এ দু'জন সম্মানিত নবীকেই সৎ সন্তান দান করেন।

ছ. ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর দীন। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এ দীনকে বিজয়ী করার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোটা নবুওয়াতী যিন্দেগীকে এ দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যয় করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পথে তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। ঈমানদার মহিলা ও শিশু কিশোররা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলের আন্তরিক ও অক্লান্ত চেষ্টা সংগ্রামের ফলে তখন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত নেই। অথচ আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যেই এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবর্তমানে এ দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আমাদের এ ভূখণ্ডে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এখানে বসবাসকারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপরই ন্যস্ত।

ইসলাম মানব জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের কোনো একটি দিকও ইসলামের বিধান থেকে মুক্ত রাখা যায়না।

সুতরাং ইসলামকে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু কেবল ইচ্ছা করলেই দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়না।

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রয়োজন এক অবিরাম ও সর্বাত্মক সংগ্রামের। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাঁর পথে সংগ্রাম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, এ সংগ্রামই পরকালের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ (الصف: ١٠ - ١١)

"হে ঈমানদার লোকেরা, আমি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সংবাদ দেব কি, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যয়শীল হবে আর তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর পন্থা, যদি তোমরা জ্ঞান রাখো।" (সূরা আস্ সফ ঃ ১০)

উপরোক্ত আলোচনা অনুযায়ী ইসলামী পরিবারের সদস্যদের ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। বস্তুত, ইসলামী পরিবারের কাজই হচ্ছে আল্লাহর পথে চলার জন্যে সংগ্রাম করা। ইসলামী পরিবারের সদস্যরা নফসের দাসত্ব করতে পারেনা, শয়তানের আনুগত্য করতে পারেনা। জাহেলী সমাজের রসম রেওয়াজ ও আচার অনুষ্ঠান মেনে নিতে পারেনা। তাগুতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আইন বিধানকে তারা স্বীকারই করতে পারেনা। তাদের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। সে পথ হচ্ছে খোদায়ী পথ। সে পথ আল্লাহর রসূলের প্রদর্শিত পথ। খোদা প্রদত্ত জীবন বিধানই হচ্ছে তাদের পথ। এ বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করাই তাদের জীবনের আসল কাজ। আর এটাই হচ্ছে পরকালের নাজাতের কাজ। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের কাজ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا

"আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরই ভালোবাসেন, যারা কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পথে লড়ে।" (সূরা আস সফ ঃ ৪)

ইসলামী পরিবারের পুরুষরা আল্লাহর পথের বীর সৈনিক। নারীরা বীরাংগনা। পুরুষরা তাদের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে। তারা উৎসাহ

উদ্দীপনা দিয়ে পুরুষদের মনকে তরতাজা করে। তাদের সংস্পর্শে পুরুষরা সান্ত্বনা লাভ করে। অন্যদিকে লাভ করে বীরত্বের প্রেরণা। ইসলামী পরিবারের শিশু কিশোররাও দীনি আন্দোলন থেকে পিছিয়ে থাকেনা। ইসলামী পরিবারের পুরুষ, নারী ও শিশু কিশোরদের অতীত ইতিহাস আজো সোনালী হরফে লেখা আছে। বদর যুদ্ধে দু'জন কিশোর আবু জেহেলকে হত্যা করে। ওহুদ যুদ্ধে একজন মহিলা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আক্রমণকারী কাফেরদের প্রতিহত করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ইসলামী পরিবারের মহিলারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তারা আহতদের সেবা করতেন এবং নিহতদের স্বগৃহে পৌছানোর ব্যবস্থা করতেন। তা ছাড়া দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে সকলেই সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করতেন।

মোটকথা, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মতো আজো প্রতিটি ইসলামী পরিবারকে ইসলামী আন্দোলনের একেকটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসাবে কাজ করা উচিত।

জ. সন্তান ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসার সীমা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দরতম কায়া তিনি মানুষকে দান করেছেন। মানুষকে তিনি সর্বোত্তম পন্থায় জীবন যাপনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দান করেছেন পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি এবং অসংখ্য আত্মীয়স্বজন। সকলে মিলে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার জন্যে তিনি তাদের দান করেছেন হাজারো নিয়ামত, ধন সম্পদ। আপনজনদের প্রতি ভালোবাসা তিনি মানুষের সহজাত করে দিয়েছেন। ধন সম্পদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। আত্মীয় স্বজন ও ধন সম্পদ এসবকে তিনি মানুষের দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্যের উপকরণ হিসেবে দান করেছেন। কিন্তু পার্থিব জীবনের এসব উপকরণ তিনি মানুষের জন্যে পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করেছেন। এগুলোর প্রতি অন্ধ মোহে মানুষ তার জীবনের আসল লক্ষ্য পরকালীন মুক্তির পথ রুদ্ধ করেও দিতে পারে। আবার এসবের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা মানুষ পরকালীন সাফল্যের পথে এগিয়েও যেতে পারে। এ পর্যায়ে কুরআন পাকের ভাষণ নিম্নরূপ ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ (الانفال : ٢٨)

"জেনে রাখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষার সামগ্রী বিশেষ। আর আল্লাহর নিকট প্রতিফল দানের অনেক কিছুই রয়েছে।" (সূরা আনফাল ঃ ২৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلاً ـ (الكهف:٤٦)

"সম্পদ ও সন্তান তো দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। বস্তুতপক্ষে টিকে থাকা নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিণামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম। আর এর প্রতিই উত্তম প্রত্যাশা করা যেতে পারে।" (সূরা কাহাফ ঃ ৪৬)

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ، ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

"মানুষের জন্যে তাদের মনঃপূত জিনিস– নারী, সন্তান, স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেত খামার বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মূলত এগুলো হচ্ছে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর সর্বোত্তম আশ্রয় তো রয়েছে আল্লাহরই নিকট।" (আলে ইমরান ঃ ১৪)

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মানুষের দুনিয়ার জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি মানুষের জন্য খুবই আকর্ষণীয় চাকচিক্যময় করে দিয়েছেন। এগুলোর প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত ও প্রবৃত্তিগত করে দিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এগুলোর প্রতি মোহ তোমাদের যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না রাখে। এমনটি হলে মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔
(المنافقون ٩)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এমনটি করবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

অতপর আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি, নিকট আত্মীয়স্বজন, ব্যবসা বাণিজ্য, ঘর সংসার প্রভৃতিকে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর ভালোবাসাকে ফাসেকী বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ۔

"হে নবী! বলে দাও ঃ তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের সন্তান সন্ততি, তোমাদের ভাই বেরাদার, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যার মন্দ হওয়াকে তোমরা ভয় করো আর তোমাদের ঘর বাড়ী যা তোমরা খুবই পছন্দ করো– এগুলো যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা করো যতোক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। বস্তুত আল্লাহ, ফাসেক লোকদের হেদায়েত করেননা।" (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

অপরদিকে স্বয়ং কুরআন ও হাদীসেই সম্পদ ও সন্তান সন্ততির বিরাট কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্পদ ব্যয় করতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং কালামে পাকে এর প্রতি বার বার তাকীদ করেছেন। এ সম্পর্কে গোটা কুরআন মজীদ জুড়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

এমনি করে সৎ সন্তান দ্বারাও মুমিনরা উপকৃত হতে পারে। এমনকি মৃত্যুর পরও সৎ সন্তানের দো'আর মাধ্যমে পিতামাতা উপকৃত হবেন বলে রসূলে খোদা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে গেছেন।

মোটকথা, সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রতি মুমিন ব্যক্তির আচরণ হতে হবে আল্লাহ তা'আলার বিধান মুতাবিক। এগুলোর প্রতি আচরণে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করা যাবেনা। এগুলোর সাথে আল্লাহর ইচ্ছামাফিক আচরণ করলে এগুলোতে রয়েছে বিরাট কল্যাণ। অন্যথায় এগুলোর মোহ মানুষের জন্যে হবে বিরাট ক্ষতির কারণ।

দশ ঃ ইসলামী পরিবারে সুন্দর জীবনের উত্তম আদর্শ

যারা আল্লাহ্‌র পরিচয় জেনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলের মাধ্যমে তিনি জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছেন সেটাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সমাজের বুকে সে বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেছে, তারাই আদর্শ মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের জীবন সৌন্দর্যের জ্যোতিতেই সমাজ আলোকিত হয়। তারা সমাজের মণিমুক্তা। তাদের জীবন সৌন্দর্যে প্রতিফলিত হয় আল্লাহর দীনের আদর্শ। ইসলামী জীবন প্রণালী, রীতিনীতি, আদব কায়দা ও আচার আচরণের তারা হয় মূর্ত প্রতীক। তাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, কর্মপন্থা ও কর্মনীতি বিমুগ্ধ করে তোলে সমাজের মানুষকে। তাদের অনাবিল পরিছন্ন জীবনধারা মানুষকে আকৃষ্ট করে আল্লাহ্‌র পথে।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।" আল্লাহ মানুষের জন্যে জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছন, তার চাইতে সুন্দর আর কোনো বিধান হতে পারেনা। আল্লাহ সুন্দর, তাঁর প্রদত্ত বিধানও সুন্দর। এই সুন্দর বিধানকে যারা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলবে, তারা হবে মানুষের মাঝে সুন্দরতম মানুষ। তাদের জীবন হবে সুন্দর জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন, মহত জীবন, আদর্শ জীবন, উন্নত জীবন। তাদের জীবন সৌন্দর্য মানব সমাজকে সৌন্দর্য দান করবে। তাদের মহত, অমায়িক ও উদার জীবন মানুষকে নিয়ে আসবে ইসলামের অতি কাছাকাছি। তাদের জীবনাদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে ইসলামের আদর্শে জীবন গড়ে তুলতে।

মুমিনের বাস্তব জীবন হবে ইসলামের সাক্ষ্য। ইসলামের সমস্ত সুন্দর গুণবৈশিষ্ট্য ফুলের মতো ফুটে উঠবে তার চরিত্রে। তার আদর্শ জীবনধারা থেকে মানুষ ইসলামকে জানবে, বুঝবে। এজন্যেই আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানব জাতির কাছে সাক্ষ্য হও।"

এখানে আমরা ইসলামী পরিবারের সদস্যদের অনুসরণের জন্যে মুমিন জীবনের কয়েকটি দিক আলোচনা করবো। আলোচনা করবো মুমিন জীবনের সুন্দরতম গুণবৈশিষ্ট্যের কথা। কথাগুলো আলোচনা করবো আল্লাহ্‌র কিতাব আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্‌র নির্দেশিকা থেকে। এবার তাহলে মূলকথা শুরু করি ঃ

এক ঃ ঈমানের সৌন্দর্য

ঈমান হলো জীবন ও জগত সম্পর্কে এক আল্লাহ কেন্দ্রিক দর্শন। আর ইসলাম হলো এই ঈমানী দর্শন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। এই ঈমানী দর্শনের জ্ঞান আমরা লাভ করেছি রসূলের মাধ্যমে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তাঁরই মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

ঈমানী দর্শনের মূলকথা হলো, এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। মানুষও তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক, পরিচালক ও শাসক। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর দাসত্ব করার জন্যে। মানুষ নিজেই নিজের জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান তৈরী করতে পারেনা। তিনি রসূলের মাধ্যমে মানুষকে জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান দিয়েছেন। মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে কিনা? যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে যাবে, তাদেরকে মহাসুখের জান্নাত দেয়া হবে। অন্যদেরকে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এই জীবন দর্শনে বিশ্বাসীরাই হলো মুমিন। আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধানের তারা অনুসারী। তাদের জীবনধারা অন্যসব মানুষের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের ঈমান ও বিশ্বাসই তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে মহত দৃষ্টিভংগি এবং সুন্দরতম জীবনধারা। তাদের চলার পথকে করে স্বতন্ত্র। সকল দিক থেকে তাদের জীবনের রীতিনীতি ও আদব কায়দা (Manner) হয় সুন্দর, চমৎকার ও অনুকরণীয়। তারা পরিণত হয় আদর্শ মানুষে। ঈমান মুমিনের মধ্যে যেসব সৌন্দর্য ও আদর্শ গুণাবলী সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে কয়েকটি মৌলিক সৌন্দর্য হলো ঃ

১. মুমিন জীবনের লক্ষ্য হবে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা। তিনি গোটা জীবনকে পরিচালিত করবেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে।

২. পরকালের জবাবদিহির চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে রাখবে।

৩. সবার চেয়ে এবং সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসবেন।

৪. আল্লাহ্কে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবেননা। গোপনে ও প্রকাশ্যে সব সময় আল্লাহ্র ভয় তার অন্তরকে কম্পিত করবে। অশ্রু বিগলিত করবে।

৫. আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে তার মাথা নত হবেনা।

৬. তিনি ভালোবাসবেন আল্লাহ্র জন্যে, ঘৃণা করবেন আল্লাহ্র জন্যে, দান করবেন আল্লাহ্র জন্যে, দান থেকে বিরত থাকবেন আল্লাহ্র জন্যে।

৭. তিনি ভরসা করবেন আল্লাহ্র উপর। সাহায্য চাইবেন কেবল আল্লাহ্র

কাছে। আশা করবেন আল্লাহ্‌র নিকট।

৮. তিনি নিজের হৃদয় মন ও যবানকে সবসময় সিক্ত রাখবেন আল্লাহ্‌র স্মরণে।

৯. আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করবেননা।

১০. নিজে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবেন এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্‌র দাস বানাবার জন্যে মমত্বের সাথে আহবান জানাতে থাকবেন।

১১. বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌কে ডাকবেন ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন।

১২. আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবেন।

১৩. জান মালের প্রকৃত মালিক মনে করবেন আল্লাহ্‌কে।

১৪. প্রকৃত সাফল্য মনে করবেন পরকালের সাফল্যকে। পৃথিবীর জীবনকে পরিচালিত করবেন পরকালীন সাফল্যের লক্ষ্যে।

দুই ঃ রসূলকে অনুসরণের আদর্শ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র শেষ নবী ও রসূল। তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁকে অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনিই পথ প্রদর্শক। আল্লাহ তাঁর কাছে অহী নাযিল করেছেন। তাঁর মাধ্যমে মানুষের জন্যে হিদায়াত ও জীবন ব্যবস্থা নাযিল করেছেন। সেই হিদায়াত ও জীবন ব্যবস্থার শিক্ষক নিয়োগ করেছেন তাঁকে। আল কুরআনের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই সঠিক ব্যাখ্যা। তিনি ছিলেন ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে। মানব সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আল্লাহ্‌র বিধানকে যেভাবে অনুসরণ করেছেন সকল মুমিনকেও তা ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনিই সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ এবং হক ও বাতিলের একমাত্র মাপকাঠি। তাঁর অনুসরণ এবং তাঁকে ভালোবাসার মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত। তাঁর ইত্তেবার (অনুসরণের) সৌন্দর্য হলো ঃ

১. আল্লাহ্‌র পরেই তাঁকে সবচাইতে বেশী ভালোবাসতে হবে।

২. তাঁকেই হক ও বাতিলের মাপকাঠি মেনে নিতে হবে।

৩. তাঁর সুন্নাহকেই জীবন প্রণালী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৪. তাঁর অনুসরণ অনুকরণকেই আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাবার উপায় মেনে নিতে হবে।

৫. তাঁর নাম উচ্চারণ করলে তাঁর প্রতি সালাত পাঠ করতে হবে।

৬. তাঁর সাথীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে হবে।

তিন ঃ দৈহিক পবিত্রতার সৌন্দর্য

পবিত্রতা তিন প্রকার ঃ ১. দৈহিক পবিত্রতা ২. মন বা চিন্তার পবিত্রতা ৩. নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা। একজন মুমিনকে তার ঈমানের আলোকে এই তিন প্রকারের পবিত্রতাই অর্জন করতে হবে। ইসলামে দৈহিক পবিত্রতার আদর্শ নিম্নরূপ ঃ

১. পায়খানায় গেলে ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ঢিলা বা টয়লেট পেপার এবং পানি ব্যবহার করবেন। হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন।

২. প্রস্রাবের পর ঢিল বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনীয় সময় ক্ষেপণ করে উত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন হবেন।

৩. গোসল আবশ্যক হলে দেরী না করে উত্তমরূপে গোসল করে নেবেন। শুক্রবারে অবশ্যি গোসল করবেন।

৪. পরিধেয় পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন।

৫. নখ বড় হতে দেবেননা। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কেটে নেবেন।

৬. চুল ছোট ও পরিচ্ছন্ন রাখবেন। চুল আঁচড়ে রাখবেন।

৭. কান পরিষ্কার রাখবেন।

৮. হারাম খাদ্য ভক্ষণ করবেননা।

৯. শরীর সুস্থ রাখবেন। প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করবেন। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করাবেন।

১০. নামায পড়ার জন্যে যথানিয়মে সুন্দরভাবে অযু করবেন। বেশী বেশী অযু করা উত্তম।

প্রিয় নবী বলেছেন ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" কুরআন বলে ঃ "আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

চার ঃ মনের সৌন্দর্য

মানুষ যখন কোনো কাজ করে, তখন প্রথমে মন মস্তিষ্ক সে বিষয়ে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর অংগ প্রত্যংগ তা বাস্তবায়ন করে। মন যদি সুন্দর চিন্তা করে, তবে অংগ প্রত্যংগ সুন্দর কাজ করে। মন যদি কুচিন্তা করে, অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অংগ প্রত্যংগ তাই বাস্তবায়ন করে। মনের কাজই চিন্তা করা। সে চিন্তামুক্ত থাকেনা। তাকে সুচিন্তার খোরাক না দিলে সে কুচিন্তা করবেই। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো মনের পিছে লেগে থাকা। তাকে সুচিন্তার

উপকরণ সরবরাহ করতে থাকা। মুমিনের মনের সৌন্দর্য হলো ঃ

১. আল্লাহ্‌র প্রেমে মনকে পাগল করে রাখবেন।

২. আল্লাহ্‌র স্মরণে মনকে ব্যস্ত রাখবেন।

৩. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকবেন।

৪. পরকালের জবাবদিহির চিন্তায় মনকে ব্যাকুল করে রাখবেন।

৫. দীনি দায়িত্ব পালনের চিন্তায় মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখবেন।

৬. সব মানুষের কল্যাণের চিন্তা করবেন। কারো অকল্যাণের চিন্তা করবেননা। মানুষকে ভালোবাসবেন।

৭. ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত রাখবেন।

৮. কুচিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখবেন।

৯. সন্দেহ, সংশয় ও কুধারণা থেকে মনকে মুক্ত রাখবেন।

১০. বৈষয়িক লোভ লালসা ও কামনা বাসনা থেকে মনকে মুক্ত রাখবেন।

১১. আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় দ্বারা মনকে আচ্ছন্ন রাখবেন।

১২. মনের মধ্যে জ্ঞানার্জনের পিপাসা সৃষ্টি করবেন।

পাঁচ ঃ ইবাদতের সৌন্দর্য

রসূলের শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা, জীবন যাপন করা এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করাই হলো ইবাদত। ইবাদতের সৌন্দর্য হলো ঃ

১. ইখলাস বা নিয়্যাতের নিষ্ঠা। অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যেই ইবাদত করতে হবে।

২. ইবাদতে কাউকেও শরীক করা যাবেনা।

৩. ইবাদত করতে হবে বিনয়ের সাথে। আল্লাহকে ভয় করে।

৪. আল্লাহ্‌কে হাযির নাযির মনে করে ইবাদত করতে হবে।

৫. ইবাদতের যাবতীয় শর্ত এবং আরকান আহকাম যথানিয়মে পালন করতে হবে।

৬. প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা যাবেনা।

৭. ফরয ইবাদতে কোনো প্রকার গাফলতি প্রদর্শন করবেননা।

৮. নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাবেন।

৯. ইবাদত করবেন মনের সন্তুষ্টি সহকারে।

১০. মনকে এমনভাবে তৈরী করে নেবেন, যাতে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমেই মন তৃপ্ত হয়।

ছয় ঃ সালাত আদায়ের সৌন্দর্য

সালাত (নামায) হলো ইবাদতের শিরোমনি। সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ সবচাইতে বেশী তাকীদ করেছেন। বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত মুমিনের মি'রাজ। সালাতের মাধ্যমে মুমিন তার মনিবের সাথে কথাবার্তা বলে। দাসত্ব প্রকাশের সবচাইতে বড় উপায় সালাত। সালাত আল্লাহ্‌র সমীপে বান্দাহর পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতীক। পরকালে সালাতের হিসেব নেয়া হবে সবকিছুর আগে। সালাতের হিসাবে পাশ করলে অন্যান্য বিষয়ে পাশ করার আশা করা যায়। হাদীসে সালাতের অনেক অনেক মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে। তাই সালাত আদায়ে অধিক সতর্ক ও যত্নবান হওয়া দরকার। সালাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা দরকার। সালাতের সৌন্দর্য হলো ঃ

১. সুন্দরভাবে অযু করা।

২. সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যাত করা।

৩. লোক দেখানোর জন্যে সালাত না পড়া।

৪. আরকান আহকাম যথাযথভাবে পালন করা।

৫. আল্লাহকে উপস্থিত মনে করা।

৬. আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও বিনয়ী হওয়া।

৭. রুকু সিজদার সময় আল্লাহর সামনে মাথা নত করছি মনে করা। পূর্ণ আত্মসমর্পণের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।

৮. সূরা কিরআত ও দোয়াসমূহ বিশুদ্ধভাবে ও বুঝে বুঝে পড়া। ধীরে পড়া।

৯. ধীর স্থিরভাবে সালাত আদায় করা।

১০. ফরয সালাত জামাতের সাথে আদায় করা।

১১. সালাত আদায়ে কোনো প্রকার গাফলতি না করা।

১২. এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্যে অপেক্ষারত থাকা। মনকে মসজিদের সাথে ঝুলিয়ে রাখা।

১৩. মসজিদে যেতে সুন্দর পোষাক পরিধান করা।

সাত ঃ কুরআন পাঠের সৌন্দর্য

কুরআন আল্লাহর কিতাব। মানুষের হিদায়াতের জন্যে তিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন। জ্ঞানের মূল উৎস এ কিতাব। এ কিতাবের কোনো বক্তব্যে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্র নেই। এর প্রতিটি অক্ষর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর দীন নিয়ে। হিদায়াত নিয়ে। কুরআনই হলো আল্লাহ্‌র দীন এবং হিদায়াত। আল্লাহ রসূলকে তাঁর দীন বিজয়ী করবার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আর রসূল দীনকে বিজয়ী করার জন্যে যে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন কুরআনই ছিলো তার গাইড বুক। কুরআন আল্লাহ্‌র পথের আহবায়ক। কুরআন আদর্শ মানুষ গড়বার শিক্ষক। কুরআন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা। কুরআন তার পাঠকের অন্তরে সর্বপ্রকার সুন্দর মানবীয় গুণ সৃষ্টি করে। তার পাঠককে সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয় মহামনিবের। কুরআন তার পাঠকের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, মনকে কোমল, উদার ও অমায়িক করে। কুরআন তার পাঠককে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কুরআনকে যে সাথী বানিয়ে নেয়, কুরআন তার চলার পথের আলো হয়। তার রূহের খোরাক হয়। কুরআন তার অন্তরকে তরতাজা রাখে। তার যবানকে আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত রাখে। আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় তাকে সম্মোহিত করে। তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান পেশ করে দেয়। তার নিরাশা দূর করে। তাকে দৃঢ়তা দান করে। কুরআনের সাথে উত্তম আচরণ করলে কুরআন তার সাথীর জন্যে পরকালে সুপারিশ করবে। কীভাবে করা যায় কুরআনের সাথে উত্তম আচরণ?

১. কুরআনকে মহামনিব আল্লাহর বাণী বলে নিশ্চিত মনে মেনে নেয়া।

২. কুরআনকে হিদায়াত ও মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করা।

৩. কুরআনকে মানব জাতির জন্যে একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়া।

৪. বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে শেখা। সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা।

৫. কুরআন বুঝে পড়া। নিবিষ্ট মনে পড়া। কুরআনের বক্তব্যকে হৃদয়ের মাঝে গেঁথে নেয়া।

৬. কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা।

৭. কুরআনের বাণী পঠিত হলে মনোযোগ সহকারে তা শুনা।

৮. আউযুবিল্লাহ বলে শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চেয়ে পাঠ আরম্ভ করা।

৯. কুরআনকে কোনো ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণার পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করা।

১০. কুরআনের হিদায়াতের আলোকে নিজের ভুল ধ্যান ধারণা ও চরিত্রকে সংশোধন করে নেয়া।

১১. প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা।

১২. কুরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্থ করা এবং প্রতিদিন তা তিলাওয়াত করা।

১৩. কুরআন পাঠকালে মনে করা যে আমি আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলছি বা আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চারণ করছি ও শুনছি।

১৪. কুরআনকে ইসলামী আন্দোলন ও জীবন যাপনের গাইড বুক হিসেবে গ্রহণ করা।

১৫. পরিবারের সবাইকে কুরআনের শিক্ষা দান করা।

আট ঃ ছাত্রজীবনের সৌন্দর্য

সামাজিক জীবনে দায়িত্ব পালনের জন্যে আত্মগঠনের সময়কালকে বলা হয় ছাত্রজীবন। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনই হলো ছাত্রজীবন। ছাত্ররাই ভবিষ্যতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে। তারাই হয় জাতির কর্ণধার। সমাজ পরিবর্তন ও আদর্শ সমাজ গড়ার দায়িত্ব তাদেরকেই পালন করতে হয়। ছাত্রজীবনে নিজেকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে সামাজিক জীবনে উপযুক্ত দায়িত্বশীল হওয়া যায়। আদর্শ সমাজ গড়ার মূলধনে পরিণত হওয়া যায়। যে ছাত্রজীবনে আদর্শ হতে পারে সে সামাজিক জীবনেও আদর্শ হতে পারে। ছাত্রজীবনের সৌন্দর্য সামাজিক জীবনকেও করে তোলে সৌন্দর্যমণ্ডিত। ছাত্রজীবনের সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. পড়ালেখার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জন।

২. জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য হবে মানুষ হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন।

৩. শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের প্রয়াস চালাবে।

৪. জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে জীবন গড়ে তুলতে হবে এবং সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫. যেকোনো পড়া বুঝে পড়বে। না বুঝলে বুঝে নেবে।

৬. শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। শিক্ষকের কোনো মত বা বক্তব্য মেনে

নিতে না পারলে শ্রদ্ধার সাথে নিজ মত প্রকাশ করবে। যুক্তি সহকারে দ্বিমত পোষণ করবে।

৭. নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত হবে। ক্লাশ শুরু হবার আগেই উপস্থিত হবে। সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

৮. শিক্ষকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনবে। পড়ার সময় মনোযোগ সহকারে পড়বে। হাতের লেখা সুন্দর করবে।

৯. নিষ্কলুষ চরিত্র গড়ে তুলবে।

১০. ছাত্রদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেবে।

নয় ঃ সন্তানের আদর্শ

আমরা সবাই পিতামাতার সন্তান। আল্লাহ ও রসূলের পর পিতামাতাই আমাদের সদ্ব্যবহার পাবার সবচাইতে বেশী অধিকারী। কুরআন বারবার পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি কারো বাবা মা যদি মুশরিক বা কাফির হয়, তবু তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কোনো নির্দেশ দিলে তা অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। তাদের সেবা করা, তাদের আদেশ শ্রবণ করা, তাদের যত্ন করা, তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেয়া এবং তাদের জন্যে দোয়া করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতামাতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" ইসলামে সন্তান জীবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ হলো ঃ

১. পিতামাতার আদেশ পালন করা। (ইসলাম বিরোধী আদেশ ছাড়া)। তাদের সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা।

২. তাদের সেবা যত্ন করা। তারা অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা।

৩. তাদের সাথে সবসময় উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার করা।

৪. তাদেরকে বিন্দুমাত্র কষ্ট না দেয়া। তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্ত না বলা।

৫. কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে নিজের মত পেশ করা। বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া।

৬. নিজের উপার্জন থেকে তাদের জন্যে ব্যয় করা।

৭. তাদের জন্যে সবসময় দোয়া করা।

৮. তাদের মৃত্যুর পর তাদের মাধ্যমে যারা আত্মীয় স্বজন হয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। তাদের ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা।

দশ ঃ পানাহারের সৌন্দর্য

১. সবসময় হালাল খাদ্য গ্রহণ করবে। হারাম খাদ্য এবং পানীয় অবশ্যি পরিত্যাগ করবে।

২. আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার শুরু করবে। (বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ)।

৩. পানাহার শেষ করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

৪. বসে পানাহার করবে। হেলান দিয়ে পানাহার করবেনা।

৫. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করবে।

৬. ডান হাতে খাবে।

৭. একই পাত্রে বা টেবিলে অন্যদের সাথে খেতে বসলে নিজের নিকটেরটা খাবে। নিজের যা পছন্দ করবে, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করবে।

৮. মেহমানদারী করবে। মেহমানের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

৯. মেহমান এলে প্রয়োজনে একজনের খাদ্য দু'জনে খাবে, কিংবা মেহমানকে অগ্রাধিকার দেবে।

১০. খাবার জিনিসের অপব্যয় করবেনা। অপচয় করবেনা।

১১. হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে খাবার শুরু করবে। খাবার শেষ হলেও পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে নেবে।

১২. ধীরে সুস্থে খাবে। ত্বরিত খাবেনা।

১৩. মুখে খাবার রেখে কথা বলবেনা।

১৪. অনেকে একত্রে খেতে বসলে একসাথে খাবার শুরু করবে।

১৫. হাড়, কাঁটা ইত্যাদি যা কিছু ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে ফেলবেনা। খাবার জায়গা অপরিচ্ছন্ন করবেনা।

১৬. পঁচা অপরিচ্ছন্ন খাবার খাবেনা।

১৭. সুষম খাদ্য গ্রহণ করবে।

এগার ঃ কথাবার্তার সৌন্দর্য

১. সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করবে।

২. হাসিমুখে কথা বলবে। মুচকি হাসবে, অট্টহাসি নয়।

৩. সুন্দর ও কোমলভাবে কথা বলবে। চিৎকার করে কথা বলবেনা। কর্কশ ভাষায় কথা বলবেনা।

৪. যার সাথে কথা বলবে, তিনি দাঁড়িয়ে থাকলে তুমিও দাঁড়িয়ে কথা বলবে। কিংবা তাকে বসতে দেবে।

৫. সোজাসুজি বসে কথা বলবে এবং শুনবে।

৬. পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অন্যের কথা শুনবে। তার চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবে।

৭. অপরের কথা শেষ হবার আগে কথা বলবেনা।

৮. যিনি বলতে চান তাকে তার সম্পূর্ণ কথা বলতে দেবে।

৯. কথাবার্তায় শ্রোতার মনে কষ্ট দেবেনা।

১০. একজনের দোষ অপরজনের কাছে বলবেনা। এমনকি তা যদি সত্যও হয়, কারণ তা গীবত।

১১. কথাবার্তা বলার সময় বিতর্ক পরিহার করবে। কেউ বিতর্ক করতে চাইলে কথা শেষ করে দেবে।

১২. বেশী শুনবে, কম বলবে।

১৩. অর্থবহ কথা বলবে। বাজে ও নিরর্থক কথা বলবেনা।

১৪. কথাবার্তায় মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করবেনা। আশান্বিত করবে। সহজতা অবলম্বন করবে।

১৫. সুবিচারমূলক কথা বলবে। অন্যায় বলবেনা। সত্য বলবে। মিথ্যা বানোয়াট বলবেনা।

১৬. শ্রোতাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

১৭. তোমার সাথে যে কথা বলবে তার মধ্যে যেনো তাকওয়া এবং আল্লাহ নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

১৮. সমস্যার কথা বলবেনা। সমাধানের কথা বলবে। সমস্যার কথা বললে সেইসাথে সমাধানের কথাও বলবে।

১৯. তোমার কথা হবে উপদেশ ও পরামর্শমূলক।

২০. শ্রোতার জন্য দোয়া করবে।

বার ঃ সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে ইসলামের আলোকে গঠন করা মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম একজন মুমিনের উপর অগণিত সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। সেই কর্তব্য কাজগুলিই মুমিন জীবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ। এখানে সবগুলো কর্তব্যের কথা আলোচনা করার সুযোগ নেই। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সৌন্দর্যের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঃ

১. বিশ্বস্ততা।
২. সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা।
৩. মানুষের কল্যাণ কামনা।
৪. মানব সেবা ও পরোপকার।
৫. দয়া ও ক্ষমা।
৬. আত্মত্যাগ।
৭. সম্মান প্রদর্শন ও স্নেহ পরায়ণতা।
৮. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা, পরমত সহিষ্ণুতা।
৯. সাহায্য, সহযোগিতা, উদারতা, অমায়িকতা ও দানশীলতা।
১০. পরামর্শ দান ও গ্রহণ।
১১. দুঃখ সুখে শরীক হওয়া।
১২. রোগগ্রস্তকে দেখাশুনা করা।
১৩. সালাম আদান প্রদান।
১৪. ঐক্য, একতা ও সংঘবদ্ধতা।
১৫. সত্য ও ন্যায়ের প্রচার প্রতিষ্ঠা।
১৬. অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও উৎখাত।
১৭. শিক্ষাদান।
১৮. মেহমানদারী।
১৯. বিবাহশাদী ও আত্মীয়তা।
২০. লেনদেন।
২১. সদাচার, শিষ্টাচার ও আদব কায়দা।
২২. বন্ধুতা ও ভালোবাসা।

এগার ঃ আখিরাতে ইসলামী পরিবার

কুরআনে পরকালীন জীবন বা আখিরাত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। আমরা এখানে প্রথমে কুরআনের আলোকে পরকালীন জীবনের একটি নাতিদীর্ঘ চিত্র পেশ করবো এবং তারপরই পেশ করবো ইসলামী পরিবারের পরকালীন জীবনের চিত্র। আশা করি এ চিত্রটি পাঠকদের উপকারে আসবে।

ক. আখিরাতের চিত্র

১ আখিরাত কি?

'আখিরাত' ইসলামের একটি পরিভাষা। প্রত্যেক মুসলমানের নিকট শব্দটি তার নিজ নামের মতোই পরিচিত।

আখিরাতের ধারণা হলো এই যে, মৃত্যুর পর মানুষের জীবনে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মানুষের রূহ আলমে বরযখে অবস্থান করে। একদিন এই গোটা বিশ্বজাহান ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেদিনটির নাম হবে কিয়ামতের দিন বা ইয়াওমুল কিয়ামাহ। সকল মানুষকে সেদিন পুনরুত্থিত করা হবে। সকল মানুষকে একস্থানে একত্রিত করা হবে। এ মহাসম্মেলনের নাম হবে 'হাশর'। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদালত কায়েম করবেন। প্রত্যেক মানুষের পার্থিব জীবনের আমল পরিমাপ করা হবে। এ পরিমাপের জন্যে সকল মানুষের পার্থিব কর্মতৎপরতা রেকর্ড করা হচ্ছে। অতপর বিচারে পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত বান্দাহ ছিলো বলে প্রমাণিত হবে, তাকে চিরস্থায়ী মহাসুখের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর যে বিদ্রোহী বলে প্রমাণিত হবে, তাকে নিদারুণ শাস্তির স্থান জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

এই হচ্ছে আখিরাত সংক্রান্ত ধারণা। এ ধারণাসহ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, মুসলমানদের ঈমানের মৌলিক অংগ। আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি মুসলিম নয়।

কুরআন হাদীসে, বিশেষ করে কুরআনে পরকাল সৃষ্টির যৌক্তিকতা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। অসংখ্য মনীষী যুক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণ পেশ করে পরকালের প্রয়োজনীয়তার কথা সুপ্রমাণিত করেছেন। প্রত্যেক মুসলিম জানেন, পরকাল তার নিজের অস্তিত্বের মতোই বাস্তব ও মহাসত্য। এখানে

কোনো প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা না করে, কুরআনের আলোকে আখিরাতের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র অংকন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

২ আখিরাতের সূচনা

আখিরাতের জীবন কখন থেকে শুরু হবে? মূলত মৃত্যু পরবর্তী জীবনই আখিরাতের জীবন। সে হিসেবে যারা ইহকাল ত্যাগ করেছেন, তারা সকলেই পরকালে পা দিয়েছেন। তাদের আখিরাতের জীবন শুরু হয়ে গেছে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মানুষ পরকালে প্রবেশ করতে থাকবে।

৩ মৃত্যু

পার্থিব জীবন থেকে পরকালীন জীবনে পা বাড়াবার মাধ্যম হলো মৃত্যু। মৃত্যুই মানুষকে পরকালের দিকে টেনে নিয়ে যায়। দুনিয়ার জীবন কেউ ধরে রাখতে পারেনা। মরণকে বরণ করতেই হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ (العنكبوت:٥٧)

"প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৫৭)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ـ

(الجمعة : ٨)

"হে নবী, এদের বলে দাও ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ, সে তোমাদের নাগাল পাবেই।" (সূরা জুমু'আ ঃ ৮)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ـ (النساء : ٧٨)

"তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকোনা কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই। যতো মজবুত কিল্লার মধ্যেই তোমরা অবস্থান করোনা কেন।" (সূরা আন নিসা ঃ ৭৮)।

অতপর কুরআন আরো বলেছে যে, মৃত্যু কোনো ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী, তার সুবিধেমতো সময় এবং পছন্দনীয় স্থানে আসবেনা। বরঞ্চ তা আসবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই নির্ধারিত সময় ও স্থানে ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا

مُّؤَجَّلًا (ال عمران : ١٤٥)

"কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারবেনা। মৃত্যুর সময়টাতো নির্দিষ্টভাবে লিখিতই রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ـ (لقمان: ٣٤)

"কোন প্রাণীই জানেনা কোথায় এবং কিভাবে তার মৃত্যু হবে।" (সূরা ৩১ লোকমান ঃ ৩৪)

আবার নেককার এবং বদকার লোকদের মৃত্যু একরকম হবেনা। নেককার লোকদের মৃত্যু হবে আনন্দময় এবং সুসংবাদবহ। পক্ষান্তরে বদকার লোকদের মৃত্যু হবে যন্ত্রণাদায়ক দুসংবাদবহ। কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (الانفال: ٥١ - ٥٠)

"ফেরেশতারা যখন কাফিরদের জান কবজ করে, তখনকার অবস্থা যদি দেখতে পেতে! জান কবজের সময় ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে থাকে আর বলতে থাকে ঃ যাও, এবার আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ করোগে। এ হলো তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই করা শাস্তি। আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেননা।" (সূরা আনফাল ঃ ৫০-৫১)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ـ (محمد: ٢٨ ـ ٢٧)

"জান কবজ করবার সময় ফেরেশতারা যখন তাদের মুখে পিঠে আঘাত হানতে থাকবে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে! তাদের এমন অবস্থা তো এ কারণে হবে যে, তারা সেইসব পথের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে আর তারা আসলেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবার কাজটি অপছন্দ করেছে।

তাই তিনি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিষ্ফল করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৭-২৮)

এইতো গেলো বদকার লোকদের মৃত্যুর সময়কার করুণ অবস্থা। কিন্তু নেককার লোকদেরকে মৃত্যুর ফেরেশতারা এসে সালাম করবে। পরবর্তী জীবনের সুখ, আনন্দ ও পুরস্কারের সুসংবাদ শুনাবে ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (النحل:٣٢)

"সেসব লোক, ফেরেশতারা যাদেরকে পবিত্র জীবনের অধিকারী অবস্থায় ওফাত দান করতে আসে, তাদেরকে বলে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যাও জান্নাতে প্রবেশ করো তোমাদের আমলের বিনিময়ে।" (আন নহল ঃ ৩২)

৪ আলমে বরযখ

মৃত্যু থেকে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মানুষের রূহ যে জগতে অবস্থান করে, তাকে বরযখ জগত বা আলমে বরযখ বলে। বরযখ শব্দের অর্থ পর্দা বা যবনিকা। অর্থাৎ এ জগতটার অবস্থান যবনিকার অন্তরালে। এ জগতটাকে 'ট্রানজিট ক্যাম্প' বলা যেতে পারে। এখানে মানবাত্মা কিয়ামতের পুনরুত্থানের জন্যে অপেক্ষমান থাকে। এ জগত সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ (المؤمنون: ١٠٠)

"আর এইসব (মরে যাওয়া) লোকদের পেছনে রয়েছে একটি বরযখ যা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।" (সূরা আল মুমিনুন ঃ ১০০)

আল কুরআন এবং হাদীসে নববীর ভাষণ অনুযায়ী বরযখ জগতেও শাস্তি ও শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের এখান থেকেই শাস্তি আরম্ভ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অনুগত বান্দাহদের জন্যে এখানেও সুখ শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বরযখকে হাদীসে 'কবর' বলা হয়েছে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তির কবর হবে হয়তো জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের গহ্বরসমূহের একটি গহ্বর।" (জামে' তিরমিযী ঃ আবু সাঈদ খুদরী)

৫ কিয়ামত–হাশর–আদালত

অতপর একদিন গোটা বিশ্বজাহান ধ্বংস হয়ে যাবে। কুরআন এ প্রলয়ের নাম দিয়েছে 'কিয়ামত' এবং 'সাআত'। এ সম্পর্কে আল কুরআন যে ধারণা পেশ করেছে, তা হলো ঃ ইস্রাফীল ফেরেশতা সিংগায় ফুঁ দেবার অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রথম ফুঁ আসমান যমীনে অবস্থিত সমস্ত সৃষ্টিকে প্রকম্পিত করে দেবে। দ্বিতীয় ফুঁতে সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতপর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে একটু ধাক্কা মতো দেবেন। এ ধাক্কার শব্দে সমস্ত মৃতই নিজস্থান থেকে পরিবর্তিত যমীনের বুকে উঠে আসবে। কুরআন কিয়ামতের ব্যাপক এবং ভয়াবহ চিত্র অংকন করেছে। আমরা এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করে দিচ্ছি ঃ

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ

(يٰس : ٤٩)

"তারা যে জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছে তা এক প্রচণ্ড শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই তা তাদেরকে আঘাত হানবে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪৯)

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ـ (القيامة : ٦ - ٩)

"তারা জানতে চায়, কিয়ামতের দিনক্ষণটি কখন আসবে?– যখন চক্ষু বিস্ফারিত হবে, চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং সূর্য চাঁদ একাকার হয়ে যাবে।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ৬-৯)

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ـ

"পরবর্তী সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে তারা কবর থেকে তাদের রবের নিকট দৌড়ে যাবে।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ـ

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট ক্ষণটি কখন উপস্থিত

হবে? তার নির্দিষ্ট সময় বলা তো তোমার কাজ নয়। তোমার রব পর্যন্তই এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ।" (সূরা আন-নাযিয়াত ঃ ৪২-৪৪)

আয়াতগুলো থেকে একথা পরিষ্কার হলো যে, কিয়ামত অবশ্যি অনুষ্ঠিত হবে। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যমীনকে পরিবর্তিত ও সুসমতল করে দেয়া হবে এবং সেখানে সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আর এটাকে বলা হয় হাশর। সেদিনটি কবে আসবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

এই পরিবর্তিত যমীনের উপর আল্লাহ দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তকার সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। এ হবে এক মহাসম্মেলন বা হাশর। এখানে আল্লাহ তাঁর আদালত বসাবেন। সমস্ত মানুষের বিচার করবেন। সেদিন সমস্ত ক্ষমতা গুটিয়ে তিনি নিজ মুষ্টিবদ্ধ করবেন। সেদিন সমস্ত মানুষ নিজের মুক্তির ব্যাপারে চরম দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হবে। সংরক্ষিত রেকর্ডের ভিত্তিতে সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ পূর্ণ ন্যায়বিচার করবেন। কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুল্‌ম করবেননা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার যাবতীয় আমলের সংরক্ষিত রেকর্ড (আমলনামা) পড়তে দেয়া হবে। অনুগত বান্দাদের আমলনামা সম্মুখ থেকে ডান হাতে দেয়া হবে। অমান্যকারীদের আমলনামা পেছন থেকে বাম হাতে দেয়া হবে। পাপীদের অংগ প্রত্যঙ্গ এবং যমীন সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবেনা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মুক্তির চিন্তায় থাকবে ব্যস্ত। সেদিন নেককার লোকদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল তরতাজা। আর পাপীদের চেহারা হবে ম্লান। সেখানে পাপীরা থাকবে চরম খরতপ্ত আযাবের মধ্যে আর নেককাররা থাকবে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে। নেককাররা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত হাউজে কাউসার থেকে পান করবে সুপেয় শরবত। আল্লাহর ইনসাফের দণ্ড থেকে সেদিন কেউ বঞ্চিত হবেনা। প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী বিনিময় ও পুরস্কার দেয়া হবে। অতপর পাপীদের নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে আর নেককারদের নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতে।

এযাবত হাশর ও বিচার সম্পর্কে যা কিছু বললাম, তা মূলত আল কুরআন প্রদত্ত ধারণারই সংক্ষিপ্ত রূপ। এই বিষয়ে কুরআন পাকে অনেক আয়াত রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব নয়। তবে সূরা যুমার থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَّنْظُرُوْنَ - وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ
وَ جِايْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ - وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ اَعْلَمُ
بِمَا يَفْعَلُوْنَ - وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى
اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْ
نَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا........ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ - وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاؤُهَا وَ فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ - (الزمر: ٦٨ - ٧٥)

"আবার (দ্বিতীয়বার) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন আকাশ ও যমীনে অবস্থিত সকলেই মরে যাবে। তবে যাদের আল্লাহ জীবিত রাখতে চান তারা ছাড়া। পরে শেষবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসাই সকলে দেখতে শুরু করবে। পৃথিবী তার খোদার নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী রসূল ও সকল সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে সত্য সহকারে ফায়সালা করা হবে। তাদের উপর কোনো যুল্ম করা হবেনা। প্রত্যেককেই সে যা আমল করেছে তার বিনিময় পুরোপুরি দেয়া হবে। লোকেরা যা কিছু করে আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। অতপর যারা কুফরী করেছিল, তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয় দেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের বলবে ঃ

তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কি এমন বাণীবাহকরা আসেনি, যারা খোদার আয়াতসমূহ তোমাদের শুনিয়েছেন এবং তোমাদের একথা বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, আজকের এই দিনটি অবশ্যই তোমাদের সামনে আসবে? ......বলা হবে ঃ জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ করো। এখন চিরকাল

এখানে তোমাদের থাকতে হবে। এটা হঠকারী লোকদের জন্য খুবই খারাপ জায়গা। আর যারা নিজেদের খোদার নাফরমানী থেকে বিরত ছিলো, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে পৌঁছে যাবে, জান্নাতের দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তখন তার ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবে ঃ সালাম– শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি। খুব ভালোভাবেই তোমরা থাকবে। প্রবেশ করো এই জান্নাতে চিরকালের জন্য।" (সূরা যুমার ঃ ৬৮-৭৫)

৬ জান্নাত ও জাহান্নাম

আদালতে আখিরাতের বিচারে যারা দুনিয়ায় আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবন যাপন করেছিল বলে প্রমাণিত হবে, তাদের দান করা হবে জান্নাত। জান্নাত এক অফুরন্ত সুখ, সম্ভোগ ও আনন্দের স্থান। জান্নাতবাসীদের সেখানে দান করা হবে সীমাহীন নিয়ামত। চিরদিন ও চিরস্থায়ীভাবে তারা সেখানে থাকবে। সেখানে তাদের ঘটবেনা মৃত্যু, থাকবেনা রোগ শোক। সেখানে যা তাদের ইচ্ছে হবে, যা তারা দাবী করবে, সবই তাদের দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে, সেদিনের বিচারে যারা দুনিয়ায় আল্লাহর সমস্ত নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর মর্জির বিপরীত চলেছিল বলে প্রমাণিত হবে, তাদের নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের আগুনে। সীমাহীন কষ্ট আর আযাবের স্থান এই জাহান্নাম। চরম কষ্ট ভোগ করেও সেখানে তাদের মৃত্যু ঘটবেনা। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ـ

"কাফিরদের জন্যে আমরা শিকল, কণ্ঠগড়া এবং দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন তৈরী করে রেখেছি।" (সূরা আদ্ দাহার ঃ ৪)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ـ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ـ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا

"জাহান্নাম একটি ঘাঁটি, খোদাদ্রোহীদের ঠিকানা। তাতে তারা অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে। সেখানে তারা ঠাণ্ডা ও পানোপোযোগী কোনো জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেনা। সেখানে তাদের খাদ্য হবে উত্তপ্ত পানি আর ক্ষতের ক্ষরণ।" (সূরা আন নাবা ঃ ২১-২৫)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا۔

"যারা ঈমান ও নেক আমল নিয়ে হাযির হবে, তাদের আমরা এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান। আর সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরা আন নিসা ঃ ১২২)

وَ اَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ..... ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرَةٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ۔

"আর বাম হাতের লোকদের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভাগ্য। লু হাওয়ার প্রবাহ, টগবগ করা ফুটন্ত পানি আর কালো কালো ধুঁয়ায় থাকবে তারা আচ্ছন্ন। তা না সুশীতল হবে আর না শান্তিপ্রদ।.... হে পথভ্রষ্ট অমান্যকারীর দল! অবশ্যি তোমাদের যাক্কুম বৃক্ষ খেতে হবে। তা দিয়ে ভর্তি করবে তোমাদের পেট।আর পিপাসার্ত উটের ন্যায় পান করবে উপর থেকে টগবগ করা ফুটন্ত পানি।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪১-৫৫)

وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ..... عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ۔ لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ..... فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ۔ وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ۔ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ وَّ فُرُشٍ

مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ـ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا
أَتْرَابًا ـ (الواقعه : ١٠ - ٣٨)

"আর (নেক কাজে) অগ্রবর্তী লোকেরাই নিকটবর্তী লোক। তাদের অবস্থান হবে নিয়ামতে ভরা জান্নাতে।.... হেলান দিয়ে মুখোমুখি বসবে তারা মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহে। আর চিরন্তন বালকেরা তাদের মজলিশে প্রবহমান ঝর্ণার সূরা পানপাত্র আর হাতলধারী সুরা-ভাণ্ড এবং আবখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তা পান করলে তাদের মাথা ঘুরবেনা, লোপ পাবেনা তাদের বিবেক বুদ্ধি। আর তারা তাদের সম্মুখে রকম বেরকমের সুস্বাদু ফল পেশ করবে। যেনো যেটা পছন্দ সেটাই তুলে নিতে পারে। তাছাড়া পাখির গোশ্তও সামনে রাখবে, যেনো পছন্দসইটি তুলে নিতে পারে। আর তাদের জন্যে রয়েছে আয়ত নয়না হুর। তারা হবে পরম সুশ্রী সুন্দরী– লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো।.... তাদের সেখানে হবে কাঁটাহীন কুল গাছ, থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছায়া আর সদা প্রবহমান পানি। সেখানে পাওয়া যাবে অফুরন্ত অবারিত বিপুল ফল আর ফল। সেখানে থাকবে তাদের জন্যে উঁচু উঁচু আসন। তাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করবো আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে। কুমারী করে বানানো হবে তাদের। স্বামীদের প্রতি হবে তারা পরমাসক্ত। বয়েসে হবে সমকক্ষ।" (সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ১০-৩৮)

৭ জান্নাত ও জাহান্নামে কারা যাবে?

জান্নাতে ও জাহান্নামে কারা যাবে, পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেও তা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। এখন এখানে সরাসরি কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করতে চাই, যেগুলোতে জান্নাত ও জাহান্নামে কারা যাবে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ـ

"যারা দুনিয়ায় খোদাদ্রোহিতা করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে, দোযখই হবে তাদের পরিণাম। আর যারা খোদার সম্মুখে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে বিরত রেখেছিল খারাপ

কামনা বাসনা থেকে, তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সূরা আন নাযিয়াত ঃ ৩৮-৪১)

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا۔ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَاءِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۔

"আমলের দিক থেকে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা তা কি তোমাদের জানাবো? এরা হচ্ছে তারা যাদের চেষ্টা সাধনা দুনিয়ার জীবনে ভ্রষ্টপথে চালিত হয়েছে। কিন্তু তারা মনে করেছিল যে, তারা খুব ভালো কাজ করছে। এসব লোকেরাই তাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহ এবং (পরকালে) তার সাক্ষাত লাভকে অস্বীকার করেছে। তাই তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে গেছে।" (সূরা আল কাহাফ ঃ ১০৫)

تِلْكَ الدَّارُ الْأٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ۔ (القصص : ٨٣)

"পরকালের সেই মহান সুখ ও শান্তির আবাস আমরা তাদের জন্যেই তৈরী করে রেখেছি যারা পৃথিবীতে দর্প, হঠকারিতা ও দাম্ভিকতা পরিহার করে চলে আর বিরত থাকে বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে।" (সূরা আল কাসাস ২৮ ঃ ৮৩)

জান্নাত ও জাহান্নামে কারা যাবে এ বিষয়ে কুরআন মজীদে ব্যাপক বিস্তীর্ণ বিবরণ রয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করেছে, আল্লাহর দাস ও অনুগত বান্দাহ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং তাঁর বিধান অনুসরণের ব্যাপারে তাঁর রসূলকে অনুসরণ করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেনি, শয়তান, নফস ও মানব সমাজের দাসত্ব করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেনি, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৮ আদর্শ সমাজ গঠনে পরকালীন চিন্তার গুরুত্ব

বস্তুত কোনো সমাজের মানুষ যদি পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং পরকালীন কল্যাণ অকল্যাণের কথা চিন্তা করে জীবন যাপন করে, তবে সে

সমাজ একটি আদর্শ মানব সমাজে রূপান্তরিত না হয়ে পারেনা। কোনো ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, পরকালে আল্লাহর আদালতে হাযির হতে হবে বলে বিশ্বাস করে, জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা যদি সদা তার হৃদয়কে ভীত কম্পিত করে তোলে, জান্নাতের লোভ ও আকর্ষণ যদি তার হৃদয়কে সদা প্রভাবিত করে রাখে, তাহলে সে আল্লাহর অনুগত আদর্শ বান্দাহ না হয়ে পারেনা। তার দ্বারা মানুষের অনিষ্ট হতে পারেনা। মানুষের প্রতি যুলুম হতে পারেনা। এ ব্যক্তি নিজের কল্যাণের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হতে বাধ্য। দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরিবর্তে পরকালে প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সে থাকবে অধিক ব্যস্ত। তার মধ্যে থাকবেনা কোনো প্রকার অহংকার, হঠকারিতা, উশৃঙ্খলতা, অনৈতিকতা। আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকে সে করবে সম্মান এবং যত্ন। এমন ব্যক্তি দ্বারা কেবল ভালো আর কল্যাণই আশা করা যায়। যে কোন কাজ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা যদি গঠিত হয় কোনো সমাজ, নিঃসন্দেহে সে সমাজ হবে এক মহান আদর্শ উচ্চমানের সংস্কৃতিবান সমাজ। এ ধরনের সমাজই সকল বিবেকবান মানুষের কাম্য। আর সেরূপ সমাজ গঠন করা ঐসব ঈমানদার খোদাভীরু লোকদের দ্বারাই সম্ভব, পরকালের মুক্তির চিন্তা যাদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

খ. ইসলামী পরিবারের পরকালীন জীবন

ইসলামী পরিবার, যে পরিবারের রূপরেখা এ বইতে আমরা তুলে ধরেছি, যে পরিবারের লোকেরা দুনিয়ার জীবন কাটিয়েছে তাদের রব আল্লাহকে ভয় করে। যাদের কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে অধিক প্রিয়। স্বামী স্ত্রী, পিতামাতা, সন্তান সন্ততি নিয়ে যারা আল্লাহ্‌র পথে চলে, চলে কুরআনের পথে আর অনুসরণ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালের মুক্তিই যাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। দুনিয়ার লোভ লালসা আর মনোহরী আরাম আয়েশের সামগ্রী যাদের কাছে তুচ্ছ। জান্নাতের ঘরই যাদের কাম্য, এরূপ খোদাভীরু সালেহ মুসলিমদের পরকালীন জীবন হবে আল্লাহর নিয়ামত আর তাঁর অনুগ্রহে পরিপূর্ণ। আল্লাহপাক তাদের জন্যে এমনসব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছেন, কোনো চোখ যা কখনো দেখেনি, কোনো কান যা কখনো শুনেনি এবং কোনো মন যা কখনো কল্পনা করেনি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা তাদের পরকালীন জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরছি।

১ তাদের মৃত্যু ও বরযখ জীবন

এসব আল্লাহভীরু লোকেরা সুন্দর পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু যাতনার পরিবর্তে জান কবজের সময় ফেরেশতারা তাদের বেহেশতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয় ঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ـ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ـ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاؤُنَ ـ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

"নেককার লোকদের জন্যে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে আর পরকালের ঘরতো তাদের জন্যে অবশ্যি কল্যাণময়। কতই না উত্তম ঘর খোদাভীরু লোকদের। চিরদিন অবস্থানের বাগ বাগিচা, তাতে তারা প্রবেশ করবে। নীচ দিয়ে প্রবহমান থাকবে ঝর্ণাধারাসমূহ। আর সেখানে সবকিছুই হবে তাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা অনুযায়ী। এই প্রতিফল দেবেন আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের। সেই লোকদের, যাদের রূহসমূহ ফেরেশতারা পবিত্র অবস্থায় কবজ করতে গিয়ে বলে ঃ "তোমাদের প্রতি সালাম। প্রবেশ করো তোমরা জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে।" (সূরা আন নহল ঃ ৩০-৩২)

মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা যে জগতে অবস্থান করে তাকে বলা হয় 'আলমে বরযখ' বা বরযখ জগত। নেককার লোকদের মৃত্যু এবং এই বরযখ জীবন সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে একটি হাদীস তুলে ধরছি ঃ

হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "অতপর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে পরকালের দিকে রওয়ানা করে তখন তার নিকট আসমান থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের গৌরবর্ণ আকৃতি সূর্যের মতো আলোকময়। তাদের সাথে বেহেশতী কাফন থাকে আরো থাকে জান্নাতের সুগন্ধী। ফেরেশতাদের সংখ্যা এতো বেশি হয় যে, যতোদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, ততোদূর পর্যন্ত তাদের উপবিষ্ট দেখা যায়। অতপর মালাকুল মউত তার শিয়রে এসে উপবিষ্ট হয়ে বলতে থাকেন ঃ হে পবিত্র আত্মা, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির

দিকে বের হয়ে এসো। এ আহবানে অত্যন্ত সহজভাবে তার রূহ দেহ থেকে বেরিয়ে আসে যেমনি সহজভাবে কোনো পাত্র থেকে পানির ফোটা বাইরে গড়িয়ে পড়ে। অতপর আযরাঈল (আঃ) সেটাকে হাতে নেন। কিন্তু অন্যান্য ফেরেশতারা সেটাকে মুহূর্তের জন্যেও তার হাতে থাকতে দেয়না। তারা রূহটিকে কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে জড়িয়ে আকাশের দিকে ছুটে যায়। (এ সুগন্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ পৃথিবীতে মন মাতানো সুগন্ধিযুক্ত যে কস্তুরী পাওয়া যায় সে রকম সৌরভই থাকে এর মধ্যে)। যে ফেরেশতাদের নিকট দিয়েই তারা উপরের দিকে যায়, তারাই তাদের জিজ্ঞেস করে ঃ এ কোন্ পবিত্রাত্মা! বাহক ফেরেশতা তার উত্তম নামে তার পরিচয় দেয়। এভাবে তারা প্রথম আসমানে পৌঁছে এবং আসমানের দরজা তাদের জন্যে খুলে দেয়া হয়। এমনি করে বাহকরা তাকে নিয়ে সপ্ত আকাশ পাড়ি জমায়। প্রত্যেক আকাশের নৈকট্য লাভকারীগণ পরবর্তী আসমান পর্যন্ত তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। সপ্ত আকাশ পাড়ি দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ আমার বান্দার আমলনামায় 'ইল্লীন' লিখে দাও এবং তাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও। কারণ, মানুষকে আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, সেখানেই তাদের ফিরিয়ে নেব এবং সেখান থেকে পুনরায় জীবিত করবো। সুতরাং তার আত্মাকে দেহের সাথে সংযুক্ত করে দাও। অতপর দু'জন ফেরেশতা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'তোমার রব কে?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমার রব।'

অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তোমার দীন কি?' সে জবাবে বলবে ঃ 'ইসলাম আমার দীন।' বলা হবে ঃ 'তোমাদের নিকট যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে বলবে ঃ 'তিনি আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমার আমল কি ছিলো?' সে বলবে ঃ 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, সেটাকে বিশ্বাস করেছি এবং সত্য বলে জেনেছি (অর্থাৎ সে অনুযায়ী আমল করেছি)।' অতপর আকাশ থেকে উচ্চস্বরে বলা হবে ঃ আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। সুতরাং তাকে বেহেশতী বিছানা বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের পোষাক পরিয়ে দাও। আর বেহেশতের একটি দরজা তার জন্য খুলে দাও। বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হলে তা দিয়ে বেহেশতের সুখ ও সুগন্ধি আসতে থাকবে। তার কবর ততোদূর প্রশস্ত করে দেয়া হবে, যতোদূর দৃষ্টি যায়। অতপর উত্তম পাষাক পরিহিত পরম সুশ্রী এক ব্যক্তি এসে তাকে বলবে ঃ সুসংবাদ নাও, এটা সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে (মৃত ব্যক্তি) জিজ্ঞেস করবে ঃ "আপনি কে? আপনার চেহারা সত্যিই মানানসই এবং প্রকৃতই আপনি উপযুক্ত সংবাদদাতা।" সে বলবে ঃ 'আমি তোমার নেক

আমল।' অতপর সে (মৃত ব্যক্তি) আনন্দচিত্তে বলে উঠবে ঃ "হে আমার রব! কিয়ামত অনুষ্ঠিত হোক যাতে করে আমি আমার পরিবার পরিজন এবং নিয়ামতরাজির কাছে পৌঁছে যেতে পারি।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায় ঃ "অতপর ফেরেশতারা তাকে বলবে ঃ 'এখন তুমি নিদ্রা যাও।' সে বলবে ঃ 'আমি আমার পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনকে আমার এই সুখের অবস্থা জানাতে চাই।' ফেরেশতারা বলবে ঃ "এখান থেকে ফিরে যাবার কোনো নিয়ম নেই। তুমি সেই নববধূর মতো এখানে শুয়ে থাকো যাকে তার রব ছাড়া আর কেউই জাগাতে পারেনা।"

২ ইসলামী পরিবারের হাশর

হাশরের কঠিন বিপদের দিন মানুষ নিজ নিজ আপনজনকে দেখলে ছুটে পালাবে। বন্ধু শত্রু হয়ে যাবে। পিতামাতা, সহোদর, স্ত্রী, সন্তান সবাই সবার শত্রু হয়ে যাবে। কিন্তু খোদাভীরু লোকদের অবস্থা হবে এর বিপরীত। তারা সেখানেও পরস্পরের আপনই থাকবে। কুরআন বলে ঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ -

"এই দিন জাগতিক বন্ধুরা পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। তবে মুত্তাকীরা নয়।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭-৬৮)

সেদিন তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল উৎফুল্ল। আল্লাহর করুণারাজির দ্বারা তারা থাকবে পরিবেষ্টিত ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ..... وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

"সেদিন একদল লোকের চেহারা হবে উজ্জ্বল আর একদলের চেহারা হবে কালো। আর যাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা আল্লাহর করুণা দ্বারা হবে পরিবেষ্টিত। আর চিরদিনই তারা এ অবস্থায় থাকবে।"

وَ وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ -

"অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন উজ্জ্বল, হাস্যময় প্রফুল্ল।"

হাশরের খরতপ্ত গরম ও প্রচণ্ড আযাব থেকে তারা থাকবে মুক্ত। আল্লাহ তাদের আশ্রয় দেবেন তাঁর আরশের ছায়ার নিচে। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন আর সেদিন তাঁর ছাড়া আর কারোই ছায়া থাকবেনা। (ঐ সাত ব্যক্তি হচ্ছে) ১. ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসক, ২. সে যুবক যার যৌবন অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও গোলামী করে, ৩. সেই ব্যক্তি যার হৃদয় পড়ে থাকে মসজিদে ৪. সেই দুই ব্যক্তি যারা কেবল আল্লাহর জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে এবং এ উদ্দেশ্যেই একে অপরের সাথে মিলিত হয় এবং এর জন্যই পৃথক হয়, ৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুপাত করে, ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে বংশীয় রূপসী সুন্দরী অসৎকর্মের দিকে আহবান করলো, কিন্তু সে জবাব দিলো, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৭. আর ঐ ব্যক্তি যে এতো গোপনে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে যে, তার বাম হাতও টের পায়না তার ডান হাত কী ব্যয় করেছে।" (বুখারী, মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা)

হযরত মুয়ায আল জুহানী থেকে বর্ণিত। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে এমন নূরের টুপি পরানো হবে, যা সূর্যের চাইতেও অধিক উজ্জ্বল। এখন তোমরাই বলো, তার পিতামাতার অবস্থা যখন এরূপ, তখন তার মর্যাদা হবে কতটা উচ্চে?" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

অপর একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে এবং নিজ পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্যে হালাল উপার্জনে তৎপর হয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবেন যে তাঁর চেহারা (পূর্ণিমা) চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে।" (মিশকাত)

আল্লাহর দেয়া বিধান মুতাবিক যারা দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করবে ইসলামের আওতায়, কুরআনের বহু জায়গায় বলা হয়েছে তাদের আমলনামা দেয়া হবে সম্মুখ দিক থেকে তাদের ডান হাতে। অতপর সূরা আল ইনশিকাকে বলা হয়েছে ঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا - وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا -

"অতপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব নেয়া হবে সহজভাবে। আর সে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবে আনন্দ চিত্তে,

খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে।" (আয়াত ঃ ৭৯)

বিচারে সফল হওয়ার পর তাদের নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের দিকে দলে দলে মিছিল করে। তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হবে নূর। এ নূরে আলোকিত হবে তাদের পথ। আলোকিত হবে সামনে ডানে। তারা পার হয়ে যাবে পুলসিরাত। জান্নাতের দ্বাররক্ষীরা সালাম দিয়ে তাদের জানাবে সম্ভাষণ।

৩ ইসলামী পরিবারের জান্নাতী জীবন

যে পরিবারের লোকেরা পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে আল্লাহর পথে চলেছে পরকালে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, সন্তান সন্ততিসহ তাদেরকে একত্রে জান্নাতে থাকতে দেবেন। তাদের জন্যে ফেরেশতারা এভাবে দোয়া করে ঃ "হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও ইলমসহ সবকিছুর উপর পরিব্যাপ্ত রয়েছো। অতএব, তুমি তাদের মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে। হে আমাদের মনিব! তুমি তাদের প্রবেশ করাও সেই চিরন্তন জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছো। আর তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির মধ্যে যারা নেককার তাদেরকেও তাদের সাথে সেখানে পৌঁছে দাও। তুমি অবশ্যি মহা পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ।" (সূরা আল মুমিন ঃ ৭-৮)

সূরা আর-রা'দে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

"সেটা হবে চিরস্থায়ী জান্নাত। তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর প্রবেশ করবে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সালেহ ও নেককার। চারদিক থেকে ফেরেশতারা আসবে তাদের খোশ আমদেদ জানাতে। তারা তাদের বলবে ঃ শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর। পৃথিবীতে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তোমরা যেভাবে সবকিছুর মোকাবিলা করেছিলে, তার জন্যে তোমরা আজ এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছো। পরকালের এ ঘর কতইনা উত্তম।" (সূরা আর্ রা'দ ঃ ২০-২৪)

সূরা আত-তূরে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ - (الطور: ٢١)

"যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানরাও ঈমানের কোনো একমাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরকেও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলে কোনো কমতি তাদের দেবনা।" (সূরা আত-তূর ঃ ২১)

কুরআনের এই আয়াতগুলো থেকে আমরা স্পষ্টভাবেই জানতে পারলাম, ইসলামী পরিবারের লোকেরা যদি সত্যিকারের ইসলামী জীবন যাপন করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবশ্যি জান্নাতে একত্রে পারিবারিক জীবন যাপন করতে দেবেন। শেষোক্ত আয়াতটি থেকে আমরা একথাও জানতে পারলাম, পরিবারের কোনো সদস্য যদি কম আমলের কারণে কম মর্যাদার জান্নাত লাভের অধিকারী হয়, তবে একই পরিবারের লোকদের একত্রে থাকার সুযোগ দেয়ার জন্যে তাকেও তার পরিবারের উচ্চ মর্যাদা লাভকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে। উচ্চ মর্যাদা লাভকারীদের তার নিকট নামিয়ে আনা হবেনা। এভাবে কোনো একটি ইসলামী পরিবারের কোনো একজন সদস্য যদি উচ্চস্তরের বেহেশত লাভ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবারের সকল বেহেশতী সদস্যদের তার উসীলায় তার সেই উচ্চ মর্যাদার বেহেশতে থাকতে দেবেন। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবেই থাকবে। তাছাড়া এই পরিবারের কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যদি মারা গিয়ে থাকে, সেও বেহেশতে তার পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হবে এবং একই সাথে থাকবে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ইসলামী পরিবারের লোকদের পরকালীন জীবন সুন্দর ও সুখময় করে তুলবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানেরাও ঈমানের পথে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্র করে দেবো আর তাদের আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করবনা। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে গচ্ছিত আছে। তাদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী আমরা সব ধরনের ফল আর গোশত তাদের বেশী বেশী করে (খেতে) দেবো। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা এগিয়ে গিয়ে পানপাত্র গ্রহণ করবে। তাতে কোনো প্রকার কোলাহল ও চরিত্রহীনতা থাকবেনা। আর তাদের সেবা যত্নে সেসব চির বালকরা দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, যারা কেবল তাদের

(খেদমতের) জন্যেই হবে। তারা এতো সুন্দর সুশ্রী হবে যেনো লুকিয়ে রাখা মুক্তা। (দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে) তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে ঃ আমরা এর পূর্বে নিজেদের ঘরের লোকদের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তিনি আমাদেরকে ঝলসিয়ে দেয়া বাতাসের আযাব থেকে রক্ষা করলেন। দুনিয়ার জীবনে আমরা তাঁর নিকটই দোয়া করতাম। প্রকৃতপক্ষে তিনি অতি বড় অনুগ্রহকারী ও দয়াবান।" (সূরা তূর ঃ ২১-২৮)

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ـ

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. *পবিত্র কুরআন মজীদ*
২. *তাফসীর ইবনে কাসীর*
৩. *তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)*
৪. *সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী*
৫. *মিশকাতুল মাসাবীহ*
৬. *রিয়াদুস সালেহীন ঃ ইমাম নববী*
৭. *এন্তেখাবে হাদীস ঃ আবদুল গাফফার হাসান*
৮. *মিনহাজুল কাসেদীন ঃ আল্লামা ইবনে কুদামাহ আল-মাকদাসী*
৯. *গুনিয়াতুত তালেবীন ঃ আবদুল কাদের জিলানী*
১০. *হালাল ও হারাম ঃ আল্লামা ইউসুফ আল্ কারদাভী*
১১. *আল মারআতুল মুসলিমাহ ঃ ফরীদ ওয়াজদী*
১২. *পর্দা ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)*
১৩. *হুকুকুয যাওজাইন* ঐ
১৪. *রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ* ঐ
১৫. *আওরত ইসলামী মুআশারা মে ঃ সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী*
১৬. *তা'রীফু আম বদীনিল ইসলাম ঃ শাইখ আলী তানতাবী*
১৭. *আ-দাবে যিন্দেগী ঃ মওলানা ইউসুফ ইসলাহী*
১৮. *আসান ফেকাহ ঃ* ঐ
১৯. *আল হুকুকু ওয়াল ফারায়েয ঃ ডিপুটি নাযীর আহমদ*
২০. *হিন্দ্ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা নেযামে তা'লীম ও তারবিয়াত ঃ প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলীম*
২১. *পরিবার ও পারিবারিক জীবন ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম*
২২. *সীরাতে সরওয়ারে আলম ২য় খণ্ড ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)*
২৩. *হায়াতে তাইয়্যেবাহ ঃ আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই*
২৪. *দীন কি হেফাযত ঃ* ঐ
২৫. *তাহরীকে ইসলামী মে কারকুনু কী বাহামী তাআল্লুকাত্ ঃ খুররম জাহ মুরাদ*
২৬. *ইসলামী নেযামে যিন্দেগী আওর উসকে বুনিয়াদী তাসাব্বুরাত (এগারখানা পুস্তিকার সংকলন) ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী*
২৭. *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম ঃ আস-সাবুনী*
২৮. *মর্‌নে কে বাদ কেয়া হোগা ঃ মওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দ শহরী।*